নবীন যুবক

প্রবোধকুমার সান্যাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা আট আনা

তৃতীয় সংস্করণ

জানুয়ারী ১৯৫৪

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত, এবং ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রয়েড আর্ট প্রিণ্টার্স-এর পক্ষ হইতে আর, দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নবীন যুবক

১

শীতের শেষে প্রথম বসন্তকালে আমার পৈতৃক গ্রাম ভালই লাগল। বাবার জমিদারিটা বেশ শাঁসালো। তিনি পুরাতন কালের মানুষ। তিনি জানেন গ্রাম আমার ভালো লাগে না, আমার জন্ম এবং কর্ম্ম-ক্ষেত্র কলিকাতায়। মা জীবিত নেই অনেক দিন। দু বছর আগে পর্য্যন্ত এই গ্রামে নিয়মিত আসতাম; মাসে একবার একদিনের জন্য। সম্প্রতি পড়াশুনো এবং নানা কাজে আর আসতে পারিনে।

দুদিনের জন্যে গ্রামে এসেছি, আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি হচ্ছে না। যে লোকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা, দেশের সম্বন্ধে নানা সংবাদ যে রাখে, খবরের কগেজে যার নাম ওঠে—গ্রামের চোখে সে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্ব্বজ্ঞ, কল্পলোকের বিচিত্র মানুষ। ইতিমধ্যেই গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ও যুবক-সঙ্ঘের উদ্যোগে গোটা দুই 'জয়ন্তী' হয়ে গেছে। সুলভ সুখ্যাতিতে এখানকার ছেলেরা আর লজ্জিত হয় না।

দু দিন ধরে' নিশ্বাস নেবার সময় ছিল না। গ্রামের যুবকদের ড্রামাটিক্ ক্লাব, ব্যায়ামের আখড়া, লাইব্রেরী এবং পল্লীসংস্কার সমিতির টানাটানিতে প্রাণ কণ্ঠাগত হচ্ছিল, এমন সময় বাবা এসে বললেন, কাল ভোর রাতের গাড়ী ধরবে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে এখানকার পাল্‌কি বলে' রাখি। টাকাকড়ি সঙ্গে থাকবে, অন্ধকারে এবার আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। হ্যাঁ, আমি শীঘ্রই কল্‌কাতায় যাবো। টেলিগ্রাম করলেই একটা বাড়ী দেখে রেখো। ও বাড়ীটায় ভাড়া এসেছে, নয় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা অর্থাৎ শ্রীযুক্ত দীননাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্থান করলেন। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে সুস্থির হয়ে বসলাম। আজ অপরাহ্ণে আর পথে বা'র হবো না, যুবজনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হতে আর সাধ নেই। গ্রামের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, হিতৈষী ও শুভানুধ্যায়িগণের সহিত দেখা করার পালা সাঙ্গ করেছি। আর একটিমাত্র জায়গা বাকি। সকলের আগে যেখানে যাবার কথা, সকলের পরে সেখানে গেলেও চলবে। গ্রামে এবার পদার্পণ করার গোপন কারণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নাম্‌ল। চা খাওয়া শেষ ক'রে পথে নেমে এলাম। যে পথটা দিয়ে চললাম এই পথে আজ দু দিন নানা কাজে ঘুরেছি, নানা অনুরোধ এবং উপলক্ষ নিয়ে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় লক্ষ্য যখন একান্ত হোলো, পথের চেহারা গেল বদলে। চলতে চলতে দুই পাশে তাল-খেজুরের বনে একটি অশ্রুত ভাষা মর্ম্মরিত হতে লাগল, আকাশের তারা পরস্পর কথা কয়ে উঠল। আমার মন অত্যন্ত স্পর্শাতুর। ঘাসের ডগা কাঁপলে আমার প্রাণ ওঠে কেঁপে, মেঘের সঙ্গে মেঘের কোলাকুলিতে আমার মাথার রক্তে দোলা লাগে।

কা'রা যেন দূরে কথা কইতে কইতে আসছিল, আমি দ্রুতগতিতে পথ থেকে নেমে অন্ধকারে আত্মগোপন করলাম। কাছে এসে যখন তারা পার হয়ে চলে' গেল, বুঝলাম আমারই আলোচনা তাদের মুখে

মুখে। নিজের চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রথমটা লজ্জিত হলাম। অথচ লজ্জিত হবার কারণ নেই। সুপরিচিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমরা একটি আজগুবী কল্পনা ক'রে রাখি, সেখান থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটলেই আমাদের মনে আসে অশ্রদ্ধা। জনসাধারনের বিচার-বুদ্ধির পরিমাপে যে উপরে উঠতে পেরেছে, সে যে প্রয়োজন হোলে নিচেও নামতে পারে এমন কথা জানবার সময় এসেছে।

গ্রামের এক প্রান্তে একখানা বাড়ীর উঠানে এসে একেবারে থামলাম। এদিকটায় বড় একটা চেনাপরিচিত কেউ নেই, চেনা ও জানা কেউ না থাকলেই খুসি হই।

মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, পিসিমা কোথায়? পিসিমা?

এই যে, আসুন। ব'লে যে বেরিয়ে এল তার জন্যই আমার এখানে আসা। হেসে দালানের উপরে উঠলাম। বললাম, কেমন আছ ভগবতী?

যদিচ বয়সে আমরা প্রায় সমবয়সী তবুও ভগবতী আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, ভালো আছি। আপনার আসতে এত দেরি হোলো কেন? মনে বুঝি পড়তেই চায় না?—চকিত ও ত্রস্ত চক্ষে সে একবার ওদিক তাকাল।

বললাম, তোমরা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে হোলে অনেক আগেই মনে পড়ত।

তা বুঝতে পেরেছি। আসুন ঘরের ভেতরে। ব'লে ভগবতী অগ্রসর হোলো।

পিসিমা কোথায়?

সন্ত্রস্ত ও অস্পষ্টকণ্ঠে সে বললে, তিনি আহ্নিকে বসেছেন।

তার নিজের ঘরে এনে আমাকে বসালো। নতুন একটা টেবল্

ল্যাম্প একধারে জল্‌ছে। বড় ঘরখানায় প্রকাণ্ড একখানা পার্শিয়ান্‌ কার্পেট্‌ পাতা। অতিথি সম্বর্দ্ধনার একটা আয়োজনের চিহ্ন সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। অবস্থা এদের এখনো ভালোই আছে।

আলোয় এসে তার দিকে ফিরে বললাম, দু বছরে তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ মিনু।

ভগবতী হেসে বললে, তবু ভালো! ভাবছিলুম ডাকনামটা আমার বুঝি ভুলেও গেলেন। বদ্‌লাব না কেন বলুন, বয়স ত বাড়ছে দিন দিন। আবার সে একবার এদিক ওদিক তাকাল, তারপর চুপি চুপি বললে, শুনুন, চিঠি পেয়েছিলেন আমার ?

আমাদের মধ্যে আপনি এবং তুমিটা বরাবরই চলে আসছে, সেটার আর পরিবর্ত্তন ঘটেনি। আমিও প্রতিবাদ করিনি, সেও দাবি জানায়নি। আমার কাছে কোনো দাবি জানানো তার পক্ষে অনেক দিক থেকেই কঠিন। আমরা খুব স্পষ্ট করেই জানি, আমাদের মধ্যে যে বস্তুটা আছে সেটা প্রেম নয়, প্রীতি। কিছু প্রাণের উত্তাপে জড়ানো একটা হাল্‌কা বন্ধুত্ব।

বললাম, চিঠি পেয়েছি বলেই ত এলাম। তুমি কি সত্যই চলে' যেতে চাও ? গ্রামে কি তোমার ঠাঁই হোলো না ?

একটু আস্তে বলুন। ঠাঁই যদি হবে তবে এতকাল পরে আপনাকে চিঠি লিখব কেন সোমনাথবাবু ? বলুন আপনি, আমার কোন ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন কিনা।

করেছি।

দরজাটা আস্তে আস্তে ভগবতী ভেজিয়ে দিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, পিসিমা যেন কিছু বুঝতে না পারেন্‌। উনি বলছিলেন আমাকে ওঁর শ্বশুর বাড়ীর দেশে নিয়ে যাবার কথা। যেতে আমার

আপত্তি ছিল না। কিন্তু সেও যে গ্রাম। এখানেও যে জ্বালা সেখানেও সেই যন্ত্রণা। আপনার কাছে কেবল এই মিনতি, আমাকে শুধু ভালো একটা জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিন্, টাকাকড়ির ব্যবস্থা আমার সব ঠিক আছে।

আমার কণ্ঠেও এবার রুক্ষতা এল। বললাম, কাল ভোর রাত্রেই যাবার ঠিক হয়েছে, রাত সাড়ে চারটের গাড়ী।

ভগবতী বললে, আমারও সব গোছানো আছে। কল্‌কাতায় গিয়ে বড়দাদাকে চিঠি দেবো, তিনি এখানকার জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করবেন।

তিনি এখন কোথায় ?

রংপুরে।

তোমাকে তিনি কাছে রাখলেন না কেন ?

সে কথাও আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে সোমনাথদা ?

বললাম, তোমার টাকাকড়ি কার কাছে ?

ভগবতী বললে, আমার নামে টাকাকড়ি মা সমস্তই ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন। তিনি বেশ দেখতে পেয়েছিলেন আমার ভবিষ্যতের চেহারাটা। মা'র কথা শুনেই যে মাথা হেঁট করলেন ?

না, আমি ভাবছি অন্য কথা, কল্‌কাতায় তোমার থাকার সম্বন্ধে—

ভগবতী এবার চিন্তিত মুখে বললে, ভাবছ আমার সঙ্গে গেলে এ গ্রামে আপনার স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হবে। লোকে যে-ভাষায় আলোচনা করবে সে-ভাষা আপনি জানেন না, আমার কিছু কিছু জানা আছে। আমাকে বিপদ থেকে তুলতে গিয়ে আপনি পড়বেন নানা বিপাকে।

ভুল বুঝবে তা'রা আমাকে।—আমি বললাম, একজন মেয়েকে সাহায্য করাটা ত আর অপরাধ নয়, কলঙ্কও নয়।

এতক্ষণ পিসিমার আবির্ভাবের কল্পনা করছিলাম। এবার বললাম, আমি এসেছি পিসিমা জানতে পেরেছেন?

ভগবতী ব্যস্ত হয়ে গিয়ে দরজাটা খুললে। বাইরে বেরিয়ে একবারটি ঘুরে এল। তারপর হাত নেড়ে ডেকে বললে, জানতে বোধ হয় পারেননি, ভালোই হয়েছে, জানবার আগেই আপনি চলে যান্। ওই সময় যাবার ঠিক ত?

হ্যাঁ।

হেঁটে যাবেন, না পাল্‌কিতে?

পাল্‌কিতেই যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বেশ আমি যাবো আপনার পাল্‌কির পেছনে পেছনে।

ভীতকণ্ঠে বললাম, যদি চেহারায় টের পায়?

সে ভাবনা আমার। আপনি তবে এখন আসুন।

পিসিমার অলক্ষ্যেই আমি দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলাম। পথের কিছুদূর গিয়েও দেখা গেল, পাথরের মূর্ত্তির মতো ভগবতী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্ল্যাটফরমের উপরে উঠে বেহারারা পাল্‌কি নামাল। রাত তখনো ঘোর অন্ধকার। স্যুটকেস ও বিছানা চাড়া সঙ্গে আর কিছু নেই। ট্রেণ আসবার দেরি ছিল না, ফ্লাগটা নামানো হয়েছে। আমি সোজা দুখানা কল্‌কাতার টিকিট কেটে আনলাম। এদিক ওদিক তাকাবার প্রয়োজন ছিল না। আমি জানি ভগবতী হাতে একটা ছোট হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে কাছাকাছিই আছে।

অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। দৈনিক সংবাদপত্র খুললেই এমন ঘটনা

অসংখ্য চোখে পড়ে ; একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। তবু এইবার রাজ্যের ভয় এবং লজ্জা দুই পায়ে এসে জড়াচ্ছে। অন্যায় উদ্দেশ্য নেই, বিপথের দিকে লক্ষ্য নেই কিন্তু এমন দুঃসাহসিক কাজ জীবনে আমার এই প্রথম। স্ত্রীলোকের সহিত আমরা কথা কই, গল্প করি, হাসি, ভালবাসি, তাদের নির্দ্দেশ মেনে চলতে খুসি হই, কিন্তু সময় বিশেষে তাদের গুরুভার আকণ্ঠ হয়ে ওঠে, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, কাঁধ থেকে তাদের নামিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি। এই অন্ধকার রাত্রে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে মনে হতে লাগল, জগতসুদ্ধ সবাই তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছি ছি করছে। মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে কথা বলবার আর মুখ রইল না।

এমন সময় বাঁশীর আওয়াজ করে' ট্রেন এসে দাঁড়াল। আধ মিনিট মাত্র থামবে। জিনিসপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বেহারাদের কিছু বকশিস দিয়ে বিদায় করলাম। তাদের চলে যাবার পরমুহূর্ত্তেই আপাদমস্তক চাদরে আবৃত করে' ভগবতী যখন দ্রুতপদে গাড়ীতে এসে উঠল, বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন তখনি ছেড়ে দিল। আমার রুদ্ধ-নিশ্বাস এতক্ষণে ধীরে ধীরে পড়তে লাগল। যেন মান-সম্ভ্রমের অগ্নি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।

এতক্ষণে ভিতরে চেয়ে দেখলাম। এত বড় গাড়ীখানায় আমরা ছাড়া আর তিনটিমাত্র প্রাণী। দুটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক একধারে নিদ্রিত। আমরা এধারে জায়গা নিলাম। জায়গা নিয়ে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি, পূর্ব্বাকাশে তখন ঈষৎ আলো দেখা দিচ্ছে। ভগবতী নীরবে বসেছিল।

বললাম, ঘুমোবার চেষ্টা করা আর বোধ হয় চলবে না, কি বল মিনু ?

মিনু প্রথমটা কথা বললে না। দেখলাম আমার অলক্ষ্যে সে চোক মুছল। এতক্ষণে আমার বোঝা উচিত ছিল তার পথশ্রমের কথাটা, অন্ধকারে তিন মাইল মাঠের পথ তাকে খালিপায়ে ছুটে আসতে হয়েছে। দুই পা তার ধূলোয় ভরে গেছে।

এবারে তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ছেড়ে যখন আসতেই হবে তার জন্যে কান্না কেন মিনু?

ভগবতী এবারে কথা বললে, মাথার ঘোমটা মাথায় রেখেই বলতে লাগল, ছেড়ে আসবার ইচ্ছে আমার কোনদিনই ছিল না, এলাম কেবল প্রাণের দায়ে। আপনি জানেন না, কবেকার একটা পারিবারিক কলঙ্কের জন্য কি নিদারুণ অপমানই আমাকে সইতে হয়েছে। তারপর, এই বয়সটাই হয়েছে আমার পক্ষে ভয়ানক বিপদ। এই বলে' সে তার হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলতে লাগল।

রূপের প্রশংসা তার না ক'রে পারিনে। গ্রামের মেয়ে হলেও তার শরীরের কোথাও অপরিচ্ছন্ন গ্রাম্যতা নেই। যৌবনের ঐশ্বর্য্য তার অপরিমিত। বললাম, বয়স তা হোলো বৈ কি। আমারই যখন তেইশ, তোমার অন্তত বাইশ নিশ্চই হয়েছে। আচ্ছা, এতদিনেও তোমার বিয়ের চেষ্টা হয়নি?

ভগবতী বললে, চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু গ্রামের লোক বিয়ে হতে দেবে কেন? প্রকাশ্যে এই, গোপনে গ্রামের কোন কোন ছেলে চিঠি লিখে জানালে, আমাকে লুকিয়ে তারা বিয়ে করতে চায়।

তুমি রাজি হলে না কেন?

কেন হলুম না সে কথা আপনাকে কেমন করে বোঝাবো?

মনের মধ্যে আর একটা প্রশ্ন উঠে দাঁড়াল। বললাম, কল্‌কাতায় যাচ্ছ কিন্তু কি নিয়ে সেখানে থাকবে?

আপাতত পড়াশুনা করব।

তারপর ?

মাথা হেঁট ক'রে ভগবতী বললে, তার পরের কথা তারপর। কলকাতায় এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের কিছুই নেই। আর তা ছাড়া যে-মেয়ে অন্ধকার রাতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়, সে কি কখনও তার ভবিষ্যৎ ভাবে ? আমি ত ভেসে চললাম !

গাড়ী গম্‌গম্ করে ছুটেছে। আকাশ অল্প অল্প পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে কোন্ ষ্টেশনে গাড়ী কতক্ষণ থেমে আবার কখন্ ছুটেছে আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি। সেদিকে লক্ষ্য করিনি বটে কিন্তু আমার চোখ ছিল ভগবতীর মনের দিকে। এই মেয়েটি কবে এবং কেমন ক'রে যে এমন কল্পনাপ্রবণ ও স্বপ্নবাদিনী হয়ে উঠেছে তা আমি জানতেও পারিনি। দুঃখ হলো, সহানুভূতি হোলো। ভগবতী বই পড়েছে বটে কিন্তু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেনি। তার কল্পনা অনুযায়ী পৃথিবী ঘোরে না, সংসার চলে না। জগতের নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে যেদিন তার হাতে-কলমে পরিচয় ঘটবে, সেদিন স্বপ্নের প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। তার এই দুঃসাহসিক যাত্রা এবং ভেসে যাওয়ার রূপটা মন যেন মেনে নিতে চাইল না। অথচ আমি অবাক হয়ে যাই ভগবতীর নির্ভরশীল মনের দিকে চেয়ে। আমাকে সে বিশ্বাস করেছে। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমাকেই সে চিঠি লিখে কলকাতা থেকে আনিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। নিজের মান সম্ভ্রম, দায়িত্ব, যৌবনকালের বিপদ-আপদ— সমস্ত সে নির্বিবাদে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কী-ই বা তার সঙ্গে আমার পরিচয়, কতটুকুই বা ; কদাচিৎ গ্রামে আসি, সকলের অলক্ষ্যে চ'লে যাই ; তার সঙ্গে আমার প্রাণের সম্পর্ক।

নেই, পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাও নেই। যারা সস্তা রঙীন কাঁচ চোখে লাগিয়ে এই ঘটনার পায়ে রঙ ধরিয়ে বলবে প্রেম, মোহ, আসক্তি, তাদের অকিঞ্চিৎকর কল্পনাও বুঝি। কিন্তু আমরা দুজনেই জানি আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কতদূরে। আমাদের দুজনেরই পথ বিপরিতমুখী।

কল্‌কাতার ভাড়া কত লাগল সোমনাথবাবু?

বললাম, একজনের দু' টাকা বারো আনা।

মানিব্যাগ থেকে একখানা দশটাকার নোট বা'র করে' সে বললে, এই টাকা ক'টা রাখুন আপনার কাছে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, সে কি কেন?

আপনি কেন খরচ করবেন আমার জন্যে?

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা, কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। থাকবার কথাও নয়। এক মুহূর্ত্তও যদি টাকা নিতে দ্বিধা করি তবে দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত লজ্জার কারণ হবে। আমি এসেছি পাল্‌কিতে, সে এসেছে হেঁটে কিছুমাত্র বিবেচনা করিনি; তাকে পথ দেখিয়ে এনেছি মাত্র, এতটুকু আত্মীয়তা প্রকাশ করিনি সুতরাং টাকা না নিয়ে অসঙ্গত ঘনিষ্টতা প্রকাশের বিন্দুমাত্রও অবসর নেই। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কল্‌কাতার খরচ অনেক, টাকা হাতছাড়া করা কি সঙ্গত হবে?

তা হোক, নিজের খরচ আমি চালাতে পারব।

বেশ, এখন রেখে দাও। সবশুদ্ধ কত খরচ হয় দেখে এক সময় হিসেব ক'রে নেওয়া যাবে।

কল্‌কাতায় গিয়ে যদি আপনার সঙ্গে আর দেখা না হয়? এখনি নিন্ না?

দেখা হয়ত হতেও পারে। যদি না হয় ঠিকানা দেবো, সেইখানেই পাঠিয়ে দিয়ো। তোমার সুবিধের জন্যই বলছি নৈলে টাকা নিতে আমার সঙ্কোচ হবে না।

ভগবতী স্নিগ্ধ হেসে আবার টাকা তুলে রাখল। জান্‌লার বাইরে চেয়ে দেখলাম, আকাশে সোনার লিখন ফুটে উঠেছে। প্রান্তরের শ্যামলতা, দূর দিগন্তের বনশ্রেণী, খাল বিলের জল এবং গ্রামান্তরের কোন। কোন। পথ ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। জান্‌লায় একটা হাতের উপর মাথার ভর দিয়ে ভগবতী নীরবে বসে রইল। যাক্ নিশ্চিন্ত জানা গেল, আমার সঙ্গে সে কোনো জটিল সম্পর্ক রাখতে চায় না।

কলিকাতার ষ্টেশনে যখন নামলাম তখন বেলা ন'টা বাজে। আমাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল। কথা বলবার কথা নয়, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কথা। জিনিসপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে আমরা পথে বেরিয়ে এলাম।

কাছেই একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ব্যাগ ও বিছানাগুলি তার উপরে তুলে কুলির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বসতেই ভগবতী জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি কোন বোর্ডিংয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন?

তোমার কি বোর্ডিংয়ে থাকার ইচ্ছে?

ভগবতী বললে, আমি নির্ব্বিঘ্নে থাকতে চাই। এক বিপদ থেকে বেরিয়ে আর এক বিপদে না পড়ি।

বিপদে পড়া না পড়া তোমার নিজের ওপর নির্ভর করে ভগবতী। —ব'লে ড্রাইভারকে শ্যামবাজারের দিকে যাবার নির্দ্দেশ ক'রে দিলাম।

গাড়ী যখন চলল, তখন সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি এখন কল্‌কাতায় কি করেন? পড়েন?

বললাম, পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

তবু তাকে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে পুনরায় বললাম, ঠিক যে কি করি তা বলতেও পরিনে। এম্‌নি দিন কাটে।

থাকেন কোথায় ?

সেটাও নির্দ্দিষ্ট ক'রে বলা কঠিন। এক জায়গায় থাকাটা ঠিক হয়ে ওঠে না।

ভগবতী বললে, কিছু কাজ নিয়ে থাকা ত দরকার।

হেসে বললাম, বাবা জানেন পড়াশুনো নিয়েই থাকি।

আর বেশি কিছু জানবার অধিকার ভগবতীর ছিল না, সে চুপ ক'রে রইল। সে আরো কিছু জানবার চেষ্টা করে এমন ইচ্ছাও আমার নয়। কি নিয়ে আমার দিন কাটে এমন প্রশ্ন শুনলেই আমার মন বিদ্রোহে বিমুখ হয়ে ওঠে। কাজের কথা বললেই কাজের প্রতি আসে অনাসক্তি। অনেক আত্মীয়ের অনেক আত্মীয়পনা দেখেছি, তাদের মৌখিক সহানুভূতি ও কৌতূহলে অপ্রসন্ন তরুণ মন উত্যক্ত হয়ে ওঠে। আজ ভগবতীর সেই চেহারা দেখলে তাকে তিরস্কারই করব, স্ত্রীলোক ব'লে ক্ষমা করব না।

শ্যামবাজারের একখানা বড় বাড়ীর ধারে এসে গাড়ী দাঁড়াল। আমি আগে নামলাম। বললাম, তুমি ভেতরে চল, লোক আছে জিনিষপত্র নিয়ে যাবে।—ব'লে গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিলাম।

গাড়ীর শব্দটা সম্ভবত ভিতরে পৌচেছিল। দরজা পার হয়ে আমরা ভিতরে ঢুকতেই যিনি এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন তাঁর দিকে চেয়ে বললাম, ভগবতী, ইনি আমার মা। এঁরই কাছে তুমি—

ভগবতী জানত মা আমার জীবিত নেই। আমার মুখের দিকে তাকাতেই অধিকতর স্পষ্টকণ্ঠে পুনরায় বললাম, ইনিই আমার মা! মায়ের অভাব এদেশে হয় না মিনু।

ভগবতী হেঁট হয়ে মা'র পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মা তার হাত ধ'রে বললেন, এসো, মা এসো, ঘর সাজিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে। ভয় কি, আমার পাশে তুমি থাকবে চিরদিন। চলো।

অপ্রত্যাশিত নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে ভগবতীর গলা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় কেঁপে উঠল, কি যেন বলতে গেল আওয়াজ ফুট্‌ল না, কেবল নীরবে মায়ের হাত ধ'রে অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হোলো।

আমার কাজ ফুরিয়েছে জানি। জানি কাজ আসে, কাজ ফুরোয়, আমি কেবল অগ্রগামী পথিক। মা আহার করবার জন্য অনুরোধ করলেন, কথা রাখতে পারলাম না, প্রখর রৌদ্রেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমি তাঁর বাধ্য নয় বলেই তিনি আমার প্রতি স্নেহান্ধ।

পরোপকারী নই, নিছক স্বার্থত্যাগ করতেও বিশেষ কুণ্ঠিত হই, কিন্তু একজনের কিছু কাজে আসতে পেরেছি এইটি অনুভব ক'রে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করি। সেই আত্মপ্রসাদের চেহারা আপন অহমিকার গায়ে সুড়সুড়ি লাগা নয়, বরং নিজের প্রকৃত মূল্য জানা, মূল্য ফিরে পাওয়া। আমরা কাজ করি, কোথাও সিদ্ধ হই কোথাও হই অকৃতকার্য্য, কিন্তু সেইটি আসল কথা নয়, কাজ করি আত্ম-প্রকাশের জন্যে. আত্মার প্রকৃতিগত বিকাশের প্রেরণা।

তিন চারদিন বন্ধুবান্ধবদের দেখিনি, ভিতরটা তৃষ্ণায় টা টা করছিল। স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের সাহচর্য্য আমার প্রিয়। পুরুষের দুঃখ-সুখের আন্তরিক অংশীদার স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। প্রথমেই গিয়ে উঠলাম গণপতির ওখানে। রাস্তার উপরেই একতালা পুরোন বাড়ী, প্রথম ঘরখানায় গণপতি থাকে। সোজা ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি সে নেই, তার পরিবর্ত্তে বসে রয়েছে জগদীশ। আদর অভ্যর্থনার প্রয়োজন হয় না, আমরা সবাই সবাইয়ের পরমাত্মীয়।

জগদীশ বললে, বসো। কোথায় ছিলে এ ক'দিন ?

দেশে। গণপতি কই ?

ভেতরে গেছে। ভারি বিপদে পড়েছে গণপতি হে। এক পাল ছেলেপুলে নিয়ে তার বোন আজ এসে হাজির। বোনের সুতিকার ব্যায়রাম।

ভয়ে কেঁপে উঠলাম। আমরা সবাই জানি গণপতির আর্থিক অবস্থার কথা। কোন্ এক বাঙালী কোম্পানীতে সামান্য চাকরী করে, নিয়মিত বেতন পায় না। দোকানে একখানা ছবি বাঁধাতে দিয়েছে আজ দেড়মাস, সাত আনা পয়সার জন্য সেখানা এখনো আনা হয়নি। কথাটা ব'লে জগদীশ ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল। চরম দারিদ্র্য চারিদিক থেকে এই ঘরখানার কণ্ঠরোধ করেছে, সে'দিকে তাকিয়ে জগদিশ পুনরায় বললে, মাসে চার পাঁচদিন ভাতের সঙ্গে তরকারি জুটত তাও এবার বন্ধ হোলো। উপায় কিছু নেই. ছোট ভাইটা বসে রয়েছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠায়, আজ অবধি একটা চাকুরি জুটল না।

এমন সময় গণপতি ভিতর এসে দাঁড়াল। আমরা কোনো প্রশ্ন করবার আগেই সে বললে, ঝগড়া বেধেছে শুনতে পাচ্ছ ?

জগদীশ বললে, তোমার বউয়ের গলাই ত শুনছি।

বরাবর তাই শুনবে।—শুষ্ক উপবাসী মুখে গণপতি বলতে লাগল, বোনটা আসতেই মা'র সঙ্গে বাধিয়েছে ঝগড়া। রান্না নিয়ে গোলমাল। অভাব অনটনের সংসারে ঝগড়া বাধলে আর,—একেই ত আমার বউ একটু রগচটা, খিটখিটে।

দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে চৌকির উপরে সে ব'সে পড়ল। বেলা তখন দুপুর বেজে গেছে।

জগদীশ উত্তেজিত হয়ে ফস ক'রে বললে, কিন্তু তোমার ভগ্নিপতির এমন ব্যবহার করা উচিত হয়নি। তোমার এই অবস্থা দেখেও স্ত্রীকে সে পাঠাল কেন?

গণপতি চুপ ক'রে রইল। ভেবেছিলাম ছুটির দিনে তাকে নিয়ে এদিক ওদিক একটু ঘুরতে বেরুনো যাবে কিন্তু তা আর সম্ভব হোল না। জগদীশ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বল্‌লে, জেল্ থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত ভালো লাগছে না. ভাবছি আবার না হয় ফ্ল্যাগ্ উড়িয়ে সরকারি হোটেলে ঢুকে পড়ি। চলো হে সোমনাথ, ওঠা যাক।

গণপতি ম্লানমুখে বললে, একটু পরে ডাক্তারখানায় যাবো ওষুধের টাকা ধার করতে পাঠিয়েছি, নৈলে যেতাম তোমাদের সঙ্গে।

চুলোয় যাও তুমি। ব'লে জগদীশ আমার হাত ধ'রে টেনে পথে বেরিয়ে পড়ল। আজকের দিনটাই আমাদের মাটি।

পথে চলতে চলতে জগদীশ বললে, টাকা এনেছিস বাড়ী থেকে?

বললাম, এনেছি।

তবে দিলিনে কেন গণপতিকে?

দিতে সাহস হোলো না যে। কী ভাববে!

জগদীশ আমার মুখের দিকে তাকাল, তাকিয়ে হাসল। বললে, পাছে অনুগ্রহ ব'লে ভাবে এই ভয় করছিস ত? পাগল আর কি, বন্ধুত্ব যেখানে প্রকৃত, আত্মসম্মানজ্ঞান সেখানে বড় নয়।

তবে তুমি রাখো জগদীশ, তুমিই দিয়ো। ব'লে পকেট থেকে টাকাগুলো বা'র ক'রে তার হাতে দিয়ে স্বস্তি পেলাম। সে বললে, দিলি বটে আমার হাতে, আমি কিন্তু পাঁচটা টাকা এর থেকে অন্তত ওড়াবো। রাজি ত?

সে তোমার খুসি।

জগদীশ অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা, তার মন্তব্যগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ব'লে কন্‌গ্রেস কমিটিতে তার জায়গা হয়নি। শত্রু এবং মিত্র—দুই পক্ষই তার উপর বিশেষ চটা। তার ভিতরে দলাদলির মনোভাব নেই বলেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে তাড়ানো হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সে বললে, জমিদারের ছেলে তুই, যে ক'টা দিন পারি তোকেই শোষণ করা যাক্‌। আমার আর কারো ওপর মায়া দয়া নেই, চক্ষুলজ্জাও নেই, বুঝলি সোমনাথ ?

বললাম, তোমার মা কোথায় ?

জানিসনে ? বুড়িকে এবার ঠেলে কাশী পাঠিয়েছি। পাঁচ টাকা বরাদ্দ, যেমন করেই হোক দেবো মাসে মাসে। মরলে পরে হাড়খানা পাথর হয়ে থাকবে বাঙালীটোলার পথে। বউটা আগেই মরেছে ছেলেটাকে নিয়ে গেছে তার মামারা। বেঁচে গেছি ভাই এযাত্রা, এবার শালা ঝাড়া হাত-পা।

আর বিয়ে করবে না ?

আবার ?—চোখ পাকিয়ে জগদীশ বললে, দেবো মাথায় তোর তিন ঠোকর। ও জাতকে আবার ঘরে আনে! দেখছিসনে গণ-পতি শালার অবস্থা ?

আর ঘাটিয়ে কাজ নেই, এর পরে দেখতে দেখতে তার মুখে হরিজনসম্প্রদায়ের ভাষা ফুটে উঠতে থাকবে, অতএব এইখানেই ক্ষান্ত হলাম। রাজপথে বহুদূর পর্য্যন্ত এসে দুজনেই আমরা পরিশ্রান্ত। মাথার উপরে চৈত্রের রোদ, প্রাসাদসঙ্কুল মহানগর কলিকাতার পথে কোথাও ছায়া নেই, মায়া নেই। চাদিকের ঐশ্বর্য্য আপন নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে উন্নতশির, প্রাণসম্পর্কহীন।

পথের উপর আমাদের পরিচিত একটি চায়ের দোকান পড়ে। শহরের অনেকগুলি বিশেষ পাড়ায় বিশেষ কতকগুলি হোটেলে আমরা নিয়মিত যাতায়াত ক'রে থাকি। এক একটি দোকান আমাদের এক একটি মিলন-কেন্দ্র। জগদীশ এক জায়গায় থেমে বললে, আয় কিছু খাওয়া যাক্।

দোকানে গিয়ে উঠে জগদীশ বললে, বিপিনবাবু, খান আষ্টেক টোষ্ট ক'রে দাও ত,—আরে লোকনাথ যে, লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে··· একেবারে গোগ্রাসে গিল্‌ছে দেখছি।

লোকনাথ মুখে একটা কি দিয়ে চিবোচ্ছিল। বললে, বড় অপরাধ করেছি! তোমারো ত জমিদারি আছে বাবা, খেতে পারো না পেট ভ'রে?

জগদীশ হেসে বললে, আমার জমিদারি? সোনার পাথর বাটি!

জমিদারি নয়ত কি। প্রচারকার্য্যের নাম ক'রে কন্‌গ্রেসের টাকা নিয়ে অন্তত ঘরের চালাটাও ত ছেয়ে নিতে পারো?

চাল ছেয়ে না নিলেও পেট ভ'রে খেয়ে নিয়েছি ক'দিন।

দুজনে তার পাশে এসে বসলাম। বিবাদ রেখে আসল কথাটা লোকনাথ এবার বললে, তোমাকেই খুঁজছিলাম সোমনাথ। আবার ওখানকার চিঠি পেয়েছি হে।

কি চিঠি তা আমিও জানি লোকনাথও জানে। কিন্তু জগদীশ কৌতূহলবশতঃ একটু ঝুঁকে পড়তেই লোকনাথ ব্যস্ত হয়ে বললে, তুমি কেন আমাদের কথায়? এসব গোপনীয় ব্যাপারে সোমনাথ ছাড়া আর কেউ—

জগদীশ হেসে বললে, তোর স্ত্রীর চিঠি বুঝি?

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। লোকনাথ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, তুই জানলি কি ক'রে ?

এইবার জগদীশ মুখ খুললে, হতভাগা, গাধা, বাঁদর—তোর স্ত্রীর চিঠির সম্বন্ধে টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত জানেনা কে ? ভদ্রঘরের মেয়ে বিয়ে ক'রে কুৎসিত ভাষায় চিঠি লেখালেখি করিস, তোদের চিঠি ফুঁড়ে বেরোয় দেহের ক্লেদ, রক্ত মাংসের দুর্গন্ধ! ওই চিঠির কথা আবার রাস্তা ঘাটে ব'লে বেড়াস ?

লোকনাথ অত্যন্ত আহত হয়েছে বোঝা গেল। অত্যন্ত উজ্জ্বল মুখ অতিরিক্ত ম্লান হোলো। কিন্তু আমরা কেউ কারো বিরুদ্ধে সহজে উত্তেজিত হইনে। অথচ সবাই সবাইকে তিরস্কার এবং কটূক্তি করার প্রাথমিক অধিকার বজায় রাখি। তবু লোকনাথ তার কথার প্রতিবাদ ক'রে বললে, ভালোবাসার চিঠির ওপর এমন মন্তব্য ক'রো না জগদীশ!

ভালোবাসা ?—জগদীশ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল, এবং তার আগুন একবার জ্ব'লে উঠলে অন্যের পক্ষে নেবানো কঠিন; বললে, কেরাণির প্রেম ? কাঁটালের আমসত্ব ? গা চাটাচাটির নাম ভালোবাসা ? তোমার প্রেমপত্রের চেয়ে বটতলার বই বরং ভালো। আমি মুখস্থ ব'লে দিতে পারি তোমার চিঠিতে কি কি আছে। বাংলা দেশের মেয়ে পতিদেবতার মনস্তুষ্টি করতে বাধ্য, তোমার মতো কেরাণির কুপ্রবৃত্তিকে খুসি ক'রে রাখাই তার স্ত্রীধর্ম্ম! লোকনাথ, প্রেমের সত্যরূপ বুঝতে গেলে সংশিক্ষার দরকার, ধ্যান ও সাধনার দরকার, আমাদের তা নেই।

আছে কিনা একদিন দেখিয়ে দেবো। লোকনাথ অভিমানাহত কণ্ঠে বলতে লাগল, তোমাদের ব'লে রেখেছি এবার চাকরি হলে

বউকে কল্‌কাতায় এনে বাসা ভাড়া করব, একদিন নেমন্তন্ন ক'রে তার হাতের রান্না তোমাদের খাওয়াবো। দেখবে তখন!

জগদীশ ততক্ষণে জুড়িয়ে গেছে। এবার হাসতে হাসতে বললে, সেই আশায় আমাদের তিন বছর কাটল, না রে সোমনাথ?

হোটেল থেকে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। খেতে পেলেই আমাদের মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ভালো খেতে পাওয়া আর ভালো ক'রে বাঁচতে পাওয়া, এই হলেই আমাদের উত্তেজনা কমে যায়। আমাদের যা কিছু স্খলন-পতন, যা কিছু বিদ্রোহ এবং আক্রোশ—তার গোড়াতে রয়েছে সুন্দর জীবন যাপনের অনন্ত তৃষ্ণা। অন্তত সোজা কথা'টা এই।

পথে নেমে লোকনাথ বলতে লাগল, দেখা হয়ে গেল তোমাদের সঙ্গে, চলো স্বামীজীর ওখানেই যাওয়া যাক্, আজ কি যেন একটা বক্তৃতা হবে বৌদিদিও ওখানে আসবেন।

বৌদিদি মানে প্রিয়ম্বদা। ভদ্রমহিলার নাম ধ'রে ডাকা চলে না; তাই সবাই আমরা বৌদিদি ব'লে থাকি। বৌদিদিটা সম্পর্ক নয়, সঙ্কেত। একহারা গড়নের গৌরবর্ণ একটি স্ত্রীলোক, পরণে চওড়া লালপেড়ে খদ্দরের শাড়ী, মাথায় ডগডগে এতখানি সিঁদুর। রাঙাপাড় শাড়ী ছাড়া তিনি আর কোন পাড়ের শাড়ী পরেন না। হাতে কয়েক গাছি মিহি সোনার চুড়ি। সুডৌল নগ্ন হাত দুখানা নেড়ে তাঁকে মাঝে মাঝে চুড়ির শব্দ করতে আমরা শুনেছি।

জগদীশ বললে, তুমি বৌদিদির খুব ভক্ত, নয়?

লোকনাথ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বল্‌লে, আমি কি একা? কত ছেলে ওঁকে দেবীর মতন পূজো করে। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে যেদিন দেশের জন্য জেলে যান্, ছেলেরা সেদিন "বন্দেমাতরম্' করতে

বলতে মুখ দিয়ে ফেনা বা'র করেছিল। ওঃ যেদিন খালাস পেলেন,··· সেদিন পথ লোকে লোকারণ্য! এমন মহীয়সী, এত বড় দেশপ্রেমিকা—

লোকনাথের উজ্জ্বল চক্ষু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

জগদীশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, বৌদিদিকে চোখেই দেখি মাত্র, আলাপ নেই, নৈলে তাঁর বয়সটা কত জিজ্ঞেসা করতুম, জানতে পারতুম কত বয়স ব'লে তিনি নিজেকে চালান্‌—

এ কি তোমার কথা জগদীশ, ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে···ছিঃ!

ভদ্রমহিলা বলেই ত ভদ্রভাবে জান্‌ব। বয়সটাই হচ্ছে মেয়েদের বড় মূলধন, এ তাঁরা জানেন। অনেক কুরূপা এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিঃস্বার্থভাবে এবং নিঃশব্দে দেশের কাজে নেমেছেন এ আমি জানি, কিন্তু তোমার ওই প্রিয়ম্বদা বৌদিদি যুব-সম্প্রদায়ের হাততালি পান্‌ কেন জানো? সুগৌরবর্ণ, সুপুষ্ট নিটোল দেহ, হাসিমাখা মুখ হাঁসের মত চলন আর ডবল্‌-ঘের-দিয়ে-পরা রাঙা শাড়ীর জেল্লা? তোমার মতো আর ক'জন ভক্ত তাঁর হাতের নাগালে আছে লোকনাথ?

কী যে বলো তুমি জগদীশ! বৌদিদির সম্বন্ধে এত কটু-কাটব্য—

ভুল করছ। তাঁকে কটু কথা বলিনি, তাঁর রসবোধ নেই। বলছি তাদের যারা বৌদিদির রসের পরিমণ্ডলে মধু-মক্ষিকার মতো বিচরণ করে। ভিক্ষার হাত পেতে থাকে তাঁর খেয়াল-খুসির ছিটে-ফোঁটার আশায়।

পশ্চাদ্‌নিন্দায় লোকনাথ ভিতরে ভিতরে সম্ভবত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জগদীশের কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে ফিরে সে বললে, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, এই ত সবাই যাচ্ছি সেখানে, গিয়ে শুনলেই ত হয় তাঁর কথাবার্তা? কি বলো সোমনাথ?

জগদীশ হাসতে লাগল।

গল্প করতে করতে সহরের একপ্রান্তে এসে পড়েছি। পশ্চিম মুখো একটা পথের মোড়ে ঘুরে আমাদের গল্প থাম্‌ল, লক্ষ্যস্থল এসে পড়েছে। লোকনাথ আমাদের আগে আগে এসে এক জায়গায় দাঁড়াল। সম্মুখে রাণীগঞ্জের টালি-ছাওয়া একখানা আধপাকা বাড়ী, তারই দালানে একজন অল্পবয়স্ক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বসে রয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর বিশেষ পরিচিত। তাঁর সম্মুখে আরো কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ উপবিষ্ট। বৌদিদিও আছেন।

লোকনাথ দালানে উঠে বললে, এদের ধরে এনেছি স্বামীজী। এই যে বৌদিদিও আছেন দেখছি, নমস্কার।

যদিও স্বামীজী বয়সে জগদীশের প্রায় সমবয়সী, তবুও একটি বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। বৌদিদি শ্রোত্রী-মণ্ডলের ভিতর থেকে লোকনাথের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এসো ভাই, আসোনি যে দু'দিন?

এই আত্মীয়তাটুকুতেই লোকনাথের গলার আওয়াজ গদ্গদ হয়ে উঠ্‌ল। গর্ব্বভরে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে একটি বিশেষ ঘনিষ্ঠতার অধিকার প্রকাশ ক'রে বৌদিদির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। বললে, এই ত এসেছি বৌদি, আপনি না দেখলে ব্যস্ত হন্ তাই যেখানেই থাকি একবার ক'রে—আপনার শরীর ভালো আছে ত?

বৌদিদি বললেন, আমার শরীর ত বরাবরই ভালো থাকে!

হ্যাঁ, তাই বলছি। যে পরিশ্রম আপনাকে করতে হয়—

আজকাল ত আমার বিশেষ পরিশ্রম নেই!

নেই? এর নাম নেই?—চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে লোকনাথ বললে, সেই চেহারা আপনার কি আর দেখ্‌ব কোনদিন? এ ত

কেবল অমানুষিক পরিশ্রমের জন্যই। আমার টাকা থাকলে এখনই আপনাকে চেঞ্জে নিয়ে যেতুম বৌদি।

বৌদিদি হেসে বললেন, নেই যখন চুপটি ক'রে বোসো।

জগদীশ হেসে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল, আমি তার অনুসরণ করলাম। খান চারেক ঘরের মধ্যে একখানা আমাদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া আছে ; সে যখনই আসুক এই ঘরে সে আশ্রয় পায়। কেবল আশ্রয়ই নয়, আমরা এই আশ্রমের প্রচার কার্য করি ব'লে নিয়মিত আহার্য্য পাবারো অধিকার রাখি। বিছানা ও প্রয়োজনীয় যৎসামান্য হাতখরচ এবং খুঁটিনাটি জিনিষপত্র ও আমাদের জন্য বরাদ্দ আছে। আমরা দুজনেই ক্লান্ত, একখানা মাদুর ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিলাম।

নাইরের কথাবার্ত্তার দিকে আগাদের কান ছিল। স্বামীজী, যিনি জীবনকৃষ্ণ ভারতী ব'লে গোকসগাজে প্রচলিত, তিনি সাধু-ডাষায় রসের খোঁচ দিয়ে বক্তৃতা করছিলেন ঃ বক্তৃতা শুনে জগদীশ ত হেসেই খুন।

'এই নতুন [illegible] সঙ্গে আজো [illegible] পরিচয় ঘটেনি, এখানকার ছেলে আর মেয়ে সবাই নতুন, নতুন সমাজ আর নতুন মন—,

জীবনকৃষ্ণের কথাগুলো অনেকটা এই ধরণের ঃ

'এই যে এদের দেখচেন, এদের সঙ্গে জনসাধারণের রুচি আর নীতি মিলবে না, বিচিত্র স্বপ্ন আর অভিনব আদর্শ নিয়ে নতুন কালে এরা জন্ম গ্রহণ করেছে এক রূপকথার দেশে। সেই চিরমন্দারের দেশ, চিরপ্রত্যাশার অলকাপুরীর নাম কি জানেন ?

কলিকাতা মহানগরী !—প্রিয়ম্বদা বলিলেন।

অস্ফুটে একটা হাসির গুঞ্জন উঠ্‌ল তার রসিকতায়। উচ্চকণ্ঠে যে হাসল সে লোকনাথ। জগদীশ চুপি চুপি বললে, উজবুক।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, প্রিয়ম্বদা সত্যই বলেছেন, এই যন্ত্রজর্জ্জর মহানগরীর চারিদিকে চেয়ে দেখুন, সমগ্র বাংলার সঙ্গে স্ফীতকায় দাম্ভিক শহরের কোথাও অন্তরের যোগ নেই। বস্তুপুঞ্জের চাপে হৃদয়াবেগ গেল শুকিয়ে, প্রাণ হোল কণ্ঠাগত; এই স্নেহলেশহীন মরুভূমির একপ্রান্তে একটি প্রাণরসের সুশ্যামল ক্ষেত্র আছে, কল্পলোকের নরনারীর দ্বারা সেই স্থান সঞ্জীবিত, এখানে জীবন-সংগ্রামের বিন্দুমাত্রও হানাহানি নেই—

জগদীশ পুলকিতকণ্ঠে চুপি চুপি বললে, লোকটা ভাবের কুয়াসায় পথ দেখতে পাচ্ছে না। একদিন দেশনেতাদের মুখে এমনি বক্তৃতা শুনে জেলে গিয়েছিলুম।

আমার মন ছিল স্বামীজীর কথার দিকে। তিনি বলছিলেন ঃ 'এই আশ্রম দেখাতে চায় আবার সেই প্রাচীন বেদান্ত-ভারতের পথ। অমৃতের পুত্র আমরা, আমরা আর্য্য সভ্যতার প্রদীপ-বাহক, পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ ক'রে আমরা আত্মস্বাতন্ত্র্য হারিয়েছি, বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি করেছি—ফিরে যেতে হবে সেই চিরনবীন পুরাতনের হাওয়ায়, দেখাতে হবে জীবনের নীতির পথ, প্রাণধর্ম্মের সহজ ও সনাতন প্রবাহ।'

বাইরে হাততালির শব্দ শুনে জগদীশ হেসে উঠ্‌ল। স্বামীজীর পরে স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। প্রিয়ম্বদা এবার দাঁড়িয়ে উঠেছেন। জগদীশ উঠে বসলো।

দেখতে দেখতে বৌদিদি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বললেন স্বামীজীর সকল মতের সঙ্গে আমার মিল নেই তা বোধহয় আপনারা

জানেন। পুরুষের নাগপাশ থেকে আজ নারীশক্তিকে মুক্তি দিতে হবে। নারীর অবাধ স্বাধীনতাই দেশের কল্যাণের পথ। পারিবারিক জীবনের সহস্র বন্ধনের ভিতরে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। আমরা পুরুষের দাসী, তাদের খেয়ালের খেলা, আমরা তাদের পাশবিকতার ইন্ধন মাত্র। আমাদের স্বাবলম্বনের উপায় নেই, অবাধ গতিবিধির স্বাধীনতা নেই. স্বতন্ত্র ধ্যান-ধারণার স্নবিধা নেই। আমরা পুরুষের ক্রীতদাসী—

এমন সময় উন্মাদের মতো লোকনাথ আমাদের ঘরে এসে ঢুকল। বললে, দেখলে জগদীশ শুনলে ত সব? তার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছিল, গলা কাঁপছে। বললে, মহীয়সী, আদর্শ স্থানীয়া...কত বড় সৌভাগ্যে আমরা ওঁকে লাভ করেছি। দেশের এই দুর্দ্দিনে ওঁর মতন...সব টুকে রাখছি, সাপ্তাহিক পত্রে ফটোস্নদ্ধ পাঠিয়ে দেবো,—এই ব'লে সে হাঁপাতে লাগল.—আমাদের মতন পুরুষ ওঁর পায়ে মাথা রাখবার যোগ্য নয়!

হঠাৎ জগদীশের মুখের চেহারা দেখে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল, আমার দিকে ফিরে বললে, সোমনাথ তুইও আজ শুন্‌লি, তোরও কতবড় সৌভাগ্য—বলতে বলতে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে সে আবার দ্রুতপদে উঠে বেরিয়ে গেল।

জগদীশ নিশ্বাস ফেলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল, তারপর হতাশ কণ্ঠে বললে, আচ্ছা, লোকনাথের কোনো রোগ নেই ত?

উষ্ণকণ্ঠে বললাম, ঠাট্টা ক'রো না জগদীশ, মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধার মূল্য হিসাবে—

জগদীশ আমার কথায় কান দিল না। শুষ্ককণ্ঠে বললে, ওই স্ত্রীলোকটার খেয়াল একদিন হয়ত শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু

দুঃখ এই বোকা লোকনাথটা চিরদিন তার স্বভাবরোগে ভুগে মরবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো জ্ব'লে উঠ্‌ল কোথাও কোথাও। বাইরের বক্তৃতাগুলো থাম্‌ল। বলা বাহুল্য, থামলেই ভালো শোনায়। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরে দেখি, জগদীশের চোখে তন্দ্রা এসেছে। কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করেছি, জায়গা পেলেই সে যখন তখন ঘুমোবার চেষ্টা করে। লোকনাথের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না; সম্ভবত সে প্রিয়ম্বদাকে বাড়ী পৌছে দিতে গেছে,—পিছনে পিছনে যেমন রোজই যায়। এই অবসরে আস্তে আস্তে উঠে আমি চায়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

দিন চারেক পরে একদিন রাত্রে বাসার দরজায় পা দিতেই মেসের ঠাকুর বললে, আপনার জন্যে একটি বাবু অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।

কোথায়?—জিজ্ঞাসা করলাম।

ওপরে, আপনার ঘরে।

দোতলায় দক্ষিণ দিকে আমার ঘর। মেসে সাধারনত একটি নিজস্ব ঘর পাওয়া কঠিন। আমি পেয়েছি তার কারন শাঁসালো জমিদারের ছেলে আমি, কিছু মুল্য বেশি দিতে পারি। নিজস্ব ঘর না হলে থাকতে পারিনে। সমস্ত দিন সকলের সঙ্গে অবাধে মিশে যাই. কিন্তু রাত্রিকালে বিশেষ একটি সময়ে নিভৃত অবকাশের প্রয়োজন হয়, তখন আর কোনো মানুষকেই ভালো লাগে না। তখন আমি একা, প্রাণের মধ্যে অনন্ত একাকীত্ব নিয়ে নীরবে রাত্রির প্রহরগুলি গুণ্‌তে থাকি। সোজা দোতলায় এসে উঠলাম।

বারান্দা পার হতে আমার কানে এল, আমারই পুরানো ভাঙা হারমোনিয়মটার আওয়াজ। বুঝতে আর বাকী রইল না এ কাজ বঙ্কিমের। হাসিমুখে ঘরে এসে ঢুকলাম।

বঙ্কিম গান না থামিয়েই হাত নেড়ে আমাকে বসতে বললে। গান বাজনায় সে পাগল। একই স্কুলে পড়েছি বরাবর, কলেজে এসে ছাড়াছাড়ি। চিরদিন রোম্যাণ্টিক্ ব'লে এই ছেলেটির একটি প্রসিদ্ধি ছিল। চেহারা সুন্দর, এবং আমার বিশ্বাস বহু যুবকের ভিতরেও সে সুন্দর। সোনার চশমার ভিতর দিয়ে তার চোখ দুটো দেখতে খুব ভাল লাগে। বাড়ীর অবস্থা স্বচ্ছল, সেই জন্য তার কোন কাজকর্ম্ম না করলেও চলে। ইংরেজি নভেল, শেলী ও রবিঠাকুরের কবিতা, বাউলের গান, এরা তার বড় প্রিয়। একটি বিশেষ রসের জগতে সে বিচরণ করে, আমাদের মতো শুষ্ক কাঠের সঙ্গে সে মাটিতে পা গুণে চলে না। এমন ভাবের স্রোতে গা-এলানো, এমন বেপরোয়া ও বেহিসেবী, এমন আত্মবিস্মৃত খেয়ালী অন্তত আমাদের মধ্যে কেউ নেই।

গান থাম্‌ল। আলোটা জ্বালতে গেলাম, সে বাধা দিয়ে বললে, থাক্, এমন চমৎকার চাঁদের আলোয় আর ঘরে আলো জ্বালিসনে।—ব'লে সে সটান চৌকির উপর শুয়ে পড়ল।

বললাম, খুঁজছিলে কেন আমাকে?

ভাবছিলুম তোমাকে নিয়ে আজ বেড়াতে যাবো। চল্, নৌকো ক'রে গঙ্গায় বেড়িয়ে আসি।

এই রাতে? যদি ঝড় ওঠে?

বঙ্কিম উঠে বসে বললে, তুই কি সত্যি বুড়ো হয়ে গেছিস? এমন ত ছিলি নে!

তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন একটা সন্দেহ হোলো। কাছে সরে' গিয়ে বললাম, পেটে কিছু পড়েছে নাকি আজ?

বঙ্কিম হাসল। হেসে বললে, ধরা যায় না একটুখানি খেয়েছি, এক পেগ্ মাত্র!—এই বলেই সে গুন্‌গুন্ ক'রে ওমর খৈয়াম আবৃত্তি ক'রে উঠ্‌ল:

'স্বপনে নিশিভোরে কে ব'লে গেল মোরে,
কাটাবি কতকাল, রে মূঢ় ঘুমঘোরে?
শুকালো আয়ু-সুধা মিটাবি কবে ক্ষুধা?
সিরাজি এই বেলা পেয়ালা নেরে ভরে!

কবিতা আবৃত্তি ক'রে বেড়ানোটা তার নেশা। তার উপরে সুরার স্পর্শ পেয়ে তাকে সামলে রাখা আজ হয়ত কঠিন হবে। এই ত্রুটির জন্য আমরা কেউই তার উপরে রুষ্ট হইনে। বরং এমন দেখেছি, বন্ধুবান্ধবদের খুব একটা চিন্তাক্লিষ্ট ও শোকাচ্ছন্ন অবস্থাকে সে সময়োচিত কোনো কবিতার অংশ আবৃত্তি ক'রে হালকা করে দিয়েছে, স্ফূর্তি ও আনন্দ বহন ক'রে এনেছে।

আবৃত্তির কিয়ৎক্ষণ পরে সে বললে, তোর সঙ্গে কথা আছে সোমনাথ। আমি আজ মা'র ওখানে গিয়েছিলুম।

তারপর?

কাছে মুখখানা সরিয়ে এনে বঙ্কিম বললে, একটি মেয়েকে তুই সেদিন ওখানে রেখে এসেছিস নাম শুনলুম ভগবতী, কে রে সে মেয়েটা? তোর কেউ হয়?

বললাম, আমার কেউ হয় না।

তবে তোর সঙ্গে পরিচয় হোলো কেমন ক'রে?

আমাদের গ্রামের মেয়ে। সেদিন এসেছে আমার সঙ্গে। কলকাতায় থেকে পড়াশুনো করবে।

ভালবাসা আছে বুঝি তোদের মধ্যে ?

ছি ছি, এমন কথা বলো না বঙ্কিম।

বঙ্কিম সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। বললে, নেই ? ধন্যবাদ। Oh, she is an angel! রূপ দেখেছি অনেক, এমন অপরূপ আর দেখিনি। বাস্তবিক, divine beauty! তোর জন্য ওকে দেখতে পেলুম, চিরদিন তোর কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব সোমনাথ।

বললাম, ব্যাপার কি হে ?

এইবার বঙ্কিম আসল কথাটা বললে, মা'র ওখানে গিয়েছিলুম, মা দিলেন পরিচয় করিয়ে। হাসি মুখে ভগবতী এমন ক'রে নমস্কার করলে, ah, it was a sight for the gods to see. সোমনাথ, এতদিন যাকে স্বপ্নেই কেবল দেখতুম আজ দেখলুম সেও মর্ত্ত্যের মানবী হতে পারে। যখন জল-খাবার দিলে এসে, তখন তার আঙুলে আমার হাত ঠেকে গেল। চিরদিন—চিরদিন আমার মনে থাকবে এই স্পর্শটুকু, আমার সমস্ত রক্তের চলাচলের মধ্যে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে যেন একটা মহাযুদ্ধের বাজনা বাজতে লাগল।

একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছো বলো ?

শুধু মুগ্ধ ? I am dead and gone! পদ্মপলাশের মতো চোখ, শ্রাবণের মেঘের মতো চুল...শরৎ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখেছিস গঙ্গার বুকে ? তেমনি তার দেহ! আমি জানাবো সোমনাথ, আমি জানাবো তাঁকে আমার হৃদয়ের ভাষা!

হেসে বললাম, সেবারেও ত তোমার এমনি অবস্থা হয়েছিল, থিয়েটারের সেই অভিনেত্রীটির সম্বন্ধে—?

সে ? damned hell! পতিতা স্ত্রীলোকরা কি জানে ভালোবাসার মর্ম্ম ? বেশ্যার খেয়ালকে প্রেম বল্‌ব ? সেটা সাহিত্যে মানায়,

জীবনে দাঁড়ায় না। আমার মনের অগাধ গভীরতার সে মূল্য দিতে পারে কতটুকু? আজ ভগবতীর কাছে গিয়ে নিজের সত্য পরিচয় আমি জানতে পেরেছি সোমনাথ।

তার কণ্ঠের আন্তরিকতা আমার মনকে স্পর্শ করল। তবু বললাম, আচ্ছা ধরো তোমার সঙ্গে ভগবতীর ঘনিষ্ঠ আলাপই হলো। কিন্তু পরে তিনি যদি জানতে পারেন তুমি মদ খাও, তুমি একজন পতিতা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত ছিলে, তাহ'লে—

বঙ্কিম উঠে এসে আমার হাত ধরলে। করুণ কণ্ঠে বললে. মানুষের চরিত্র কি একদিন বদ্‌লাতে পারে না সোমনাথ? কবে আমি আমার কুপ্রবৃত্তিকে কিছু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিলুম সেইটেই কি আমার মহত্তর সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? আমি ত সামান্য, কিন্তু যে-কোনো জগৎ-বরেণ্য লোকের কথা ভাবো, যারা নিয়ে গেছে মানুষকে যুগে যুগে সৎ ও সত্যের পথে, তাদের জীবনেও কি যৌনপ্রকৃতির সাময়িক তাড়না ছিল না? ধার্ম্মিক ও নীতিবিদরা কি জৈবিক ধর্ম্ম পালন করেন নি?

ভালো হোক বা মন্দ হোক. নিজের কোনো একটা বিশেষ মতকে নানা সম্ভব ও অসম্ভব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বঙ্কিমের চিরকাল। আমি জানি তার এই সমস্ত বক্তৃতা ও পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষার পিছনে ছিল ভগবতীর প্রতি আসক্তি। সুন্দরী নারীর মোহ মানুষকে এক আশ্চর্য্য পথে নিয়ে যায়। আসক্তির সঞ্চার হয় যে-পাত্রে, সেই পাত্র থেকে একই কালে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে নীতি ও নীচতা, ধর্ম্মবুদ্ধি ও ঈর্ষা, উদারতা ও প্রলোভন, ঔদাসীন্য ও দীনতা। নারীর সংস্পর্শে এলে পুরুষের প্রকৃত চেহারা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।

হেসে বললাম, তোমার কথা বলছিনে কিন্তু ভগবতী যদি তোমার সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে পারেন?

জানতে না পারেন সেই ভারটাই তোমাকে নিতে হবে সোমনাথ। তিনি আমাকে ঘৃণা করলে আমি—আত্মহত্যা করব। আশা করছি আমার যত কিছু লজ্জা তাঁর স্পর্শে সোনা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি যদি তাঁকে ভালোবাসি তোমার কোনো আপত্তি নেই ত?

এইবার হেসে উঠলাম, আপত্তি? কি আশ্চর্য্য! একটী ছেলে একটী মেয়েকে ভালোবাসবে, আমার আপত্তি?

বঙ্কিম বললে, তোমার মনের কোণে তাঁর সম্বন্ধে কোনোরূপ কিছু—?

কিছুমাত্র না, তুমি নিশ্চিন্ত হও।—ব'লে সুইচ্‌ টিপে আলোটা জ্বেলে দিলাম।

বঙ্কিম উঠে দাঁড়িয়ে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, আমি যদি আজ জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ লাভ করি তবে—তবে সে কেবল তোরই দয়ায় সোমনাথ। আজ আসি ভাই।—বলেই সে একটি কবিতার চরণ ধরলে:

> 'দে দোল্‌ দোল্‌। দে দোল্‌ দোল্‌।
> এ মহাসাগরে তুফান তোল্‌।
> বধূরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল।'

বলতে বলতে উল্লাসে ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেল।

আলোটা জ্বেলেছিলাম কিন্তু জ্বেলে রাখার আর কিছু প্রয়োজন রইল না, সুইচ্‌ বন্ধ ক'রে বাইরে গেলাম। মেসের নানা লোকের নানা কণ্ঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় একবার চেয়ে দেখলাম, আপন আত্মার অনন্ত নৈঃশব্দ্য নিয়ে আমি একান্তই একা।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ছাতে উঠে এলাম। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় দিগদিগন্ত প্লাবিত হয়ে গেছে।

কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত একটা নূতন কর্ম্মপথ আমার চোখের সম্মুখে ছিল। গ্রামে ফিরে গিয়ে নূতন গ্রাম গড়ব। স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, সভ্যতায় সেই গ্রাম হবে দেশের আদর্শস্থানীয়। দেবতার মন্দির দাঁড়িয়ে উঠবে গ্রামের চারিদিকে, দুঃখী-দরিদ্রের অভাব-অভিযোগ কোথাও শোনা যাবে না, প্রত্যেক মানুষ আপন আপন অধিকার সমানভাবে বণ্টন ক'রে নেবে, দরিদ্র ও ধনাঢ্যের ভিতরে পার্থক্য যাবে ঘুচে। কিন্তু অল্পে অল্পে জানতে পেরেছি তা হবার যো নেই। মদীয় পিতৃদেব অত্যন্ত রক্ষণশীল। একদিন আমার কর্ম্মপদ্ধতির একটা খসড়া তাঁর কাছে ধরতেই তিনি হাসি মুখে এমন একটি বক্তৃতা দিলেন যে, আমার আইডিয়াগুলো সব ধোঁয়ার মতো উড়ে গেল। বক্তৃতাটার মর্ম্ম এই, পৈতৃক সম্পত্তিকে যারা সুলভ সাম্যবাদের আওতায় ফেলে ঈর্ষাকাতর অকর্ম্মণ্য সাধারণের লুণ্ঠনের সামগ্রী ক'রে তোলে তারা আর্য্য সভ্যতার ঘোরতর শত্রু। পশ্চিমের ধার-করা মতবাদ ও আদর্শ আমাদের দেশের মাটিতে শিকড় পায় না। এই সকল উপদেশের পর পিতৃদেব আমাকে অনুরোধ করেছেন, এবার থেকে সৎসঙ্গে মেশবার চেষ্টা ক'রো সোমনাথ। তোমাকে কলকাতায় আর একলা রাখা চলছে না, তুমি ভুল পথেই যাচ্ছ।

হয়ত তাই হবে, হয়ত ভুল পথেই চলেছি। পথ নেই, নবীনের চলবার পথ বড় জটিল, ভুল পথে গিয়েই তাকে জীবনের চেহারা দেখে নিতে হবে। জানি, আমার চরিদিকে যে-সমাজ আজ প্রসারিত তার ভিতরে কেবলই দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব, কেবলই সংশয় আর জিজ্ঞাসা।

কোথাও সমস্যা জেগে উঠছে বিস্ফোটকের মতো, কোথাও প্রতিবাদ জ্বলে' উঠছে দাবানলের মতো। কোন্ অলক্ষ্য ছিদ্রপথ দিয়ে এসেছে জীবনের প্রতি এই বৈরাগ্য, এই অতৃপ্তি? বর্ত্তমান যুগ কোন্ বাণী বহন করে' এনেছে, কোন্ সত্যের পথে সে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে?

জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে,—আমার চোখে নাম্‌ল তন্দ্রা।

সকাল বেলা উঠে সবেমাত্র চা খেয়ে সুস্থির হয়ে বসেছি এমন সময় নিচে থেকে ডাক পড়্‌ল। সম্ভবত জগদীশ কি লোকনাথ কেউ হবে। কিন্তু সূর্য্যোদয় হতে না-হতেই তারা যে শয্যাত্যাগ ক'রে আসবে এমন কথা ত তাদের শাস্ত্রে লেখা নেই। সূর্য্যোদয় তারা কোনদিন দেখেছে কিনা সন্দেহ।

ডাক শুনে নিচে নেমে যেতে হোলো। সদর দরজায় পা দিয়েই দেখি আমাদের বাড়ীর পুরনো বুড়ো চাকর দাঁড়িয়ে। খুসি হয়ে হেসে গিয়ে তার হাত ধরলাম—কিরে দুখীরাম কবে এলি তোরা? বাবা খবর না দিয়েই এসে পড়লেন যে?

দুখীরাম হাতটা ছাড়িয়ে নিল। বললে, আমি তোমার মুখ দেখতে চাইনে।

তার মুখের চেহারা দেখে ত্রস্ত হলাম। দুখীরাম আমার মৃতা মাতা ও জীবিত পিতার পরম বিশ্বাসী ভৃত্য। আমাদের পরিবারের তিন পুরুষের ইতিহাসের সঙ্গে এই লোকটা বিশেষভাবে জড়িত। লোকটার বাড়ী বিহারের চম্পারণ জেলায়, কিন্তু বাঙ্গালী ব'লে তাকে স্বীকার না করলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। সে যেন আমার পিতা ও মাতার সংমিশ্রিত বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি

হেসে বললাম, মুখ দেখবিনে কেন, দাড়ি কামাইনি ব'লে?

আমার হাসির উত্তরে সে চোখ পাকিয়ে বললে, বাবু এসেছেন, তা জানো ?

সে ত' তোকে দেখেই বুঝতে পাচ্ছি, তুই ত তাঁর গাধাবোট।

সম্ভবত দুখীরাম এতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মসম্বরণ ক'রেছিল, এইবার সে হঠাৎ বিদীর্ণকণ্ঠে কেঁদে উঠ্‌ল এবং আমাকে একেবারে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, দাদা গো, আমরা ভেবেছিলুম পুলিশে আর তোমাকে ছাড়বে না···বাবু এখানে এসেই উকীলের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করছেন—

বিস্মিত হয়ে বললাম, পুলিশ ? উকীলের বাড়ী· হাঁটাহাঁটি ? ব্যাপারটা কি বল্ দিকি ?

দুখীরাম আমাকে টান্‌তে টান্‌তে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে বললে, আবার ধরবে, আবার ধরবে, এখুনি চলো আমার সঙ্গে···তোমাকে এমন লুকিয়ে রাখবো যে···ধিঙ্গি রাক্কুসির পাল্লায় প'ড়ে তোমার এই অবস্থা—

আঃ ছাড়্‌ দুখীরাম, রাস্তার মাঝখানে মেয়েলিপনা করিসনে।

একটা হাত দুখীরাম কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। চোখ মুছে বললে, শিগগির চলো আমার সঙ্গে নৈলে চেঁচিয়ে আমি হাট বাধাবো। আজ পাঁচ দিন ধ'রে আমার উপবাস—বলতে বলতে আবার তার গলা বন্ধ হয়ে এল।

দুখীরামের চোখের জল আমি জীবনে দেখিনি। একজন কাঁদে আর একজনের জন্য, এই দৃশ্য দেখলে আমি যেন কোথায় ভেঙে পড়ি। মুখে কেবল বললাম, কি আশ্চর্য্য, এই ত যাচ্ছি তোর সঙ্গে, অমন করিস কেন দুখীরাম ? এইবার বল্ কি হয়েছে।

পথের মোড়ে এসে সে একখানা গাড়ী ডেকে আমাকে তোলবার চেষ্টা করলে। বিরক্ত হয়ে বললাম, জমিদারের ছেলে আমি, থার্ডক্লাস ছ্যাকড়ায় চড়িনে। হাতী যখন এখানে পাওয়া যাবে না তখন তোরই কাঁধে চড়ে, যাই চল্।

অগত্যা একখানা ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে উঠলাম। উঠেই আমার মুখে হাসি। কিছু দুঃখ দিতে পেরেছি দুখিরামকে, এই আনন্দে মন খুসিতে ভরে উঠেছে। এটা বেশ জানিয়ে দিলাম আমি আজকাল নিতান্ত সামান্য লোক নয়, আমার বহুদর্শন ঘটেছে। এও তাকে জানাতে ভুললাম না, যেমন বরাবর তাকে জানিয়ে এসেছি, পিতৃবিয়োগের পর যেদিন জমিদারিটা আমার হাতে আসবে, একদিন আসবেই, সেদিন তাকে 'ষ্টেটের ম্যানেজার' করে দেবো।

গাড়ী থামলে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দুখীরাম আমার হাত ধ'রে নাম্‌ল। নতুন একখানা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে। প্রথমেই কয়েকজন চোগা চাপকান পরা অপরিচিত লোকের ভিতর থেকে আমাদের গ্রামের চক্রবর্ত্তী মশাইকে দেখা গেল। দুখীরাম বিজয়-গর্ব্বে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে সকলের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। সকলের মুখে চোখে কৌতুহল দেখে বিরক্তিও হোলো, একটু ভীতও হলাম। আমি যেন একটা অদ্ভুত জীব।

কবে এলেন ন-কাকা?

চক্রবর্ত্তী মাথা হেঁট ক'রে সরে গেলেন। আমি অবাক হয়ে সকলের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলাম। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপরই দুখীরামের অনুসরণ করে' সোজা ভিতরে গেলাম। সুমুখে চিন্তাকুল চোখে চেয়ে বাবা ব'সে রয়েছেন।

হঠাৎ একটা অজানা আশঙ্কা ও লজ্জায় সন্ত্রস্ত হলাম কিন্তু সেও মুহূর্ত্ত মাত্র, পরক্ষণেই সাহসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, টেলিগ্রাম না করেই এখনে এলেন যে ?

জানিয়ে এলে কি তোমার কোনো সুবিধে হোতো ?

ওরে বাবা ! চাঁচাছোলা গলার আওয়াজ, রসের আমেজটুকু পর্য্যন্ত নেই। বেশ অনুভব করছি দরজার বাইরে অনভিপ্রেত জনতা দাঁড়িয়ে কান পেতে আমাদের অর্থাৎ পিতা ও পুত্রের আলোচনা শুনছে।

নিজের কুণ্ঠার কারণ নিজেই বুঝতে পাচ্ছিনে, তবুও অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে একখানা চৌকির উপর মাথা হেঁট ক'রে বসলাম। বাবা সোজা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, এতটা তোমার কাছে আমি আশা করিনি সোমনাথ।

মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম, তাঁর চোখের উপর আমার চোখ স্থির হয়ে রইল। দরজার কাছে আড়ালে দাঁড়িয়ে দুখীরাম আমাকে পিতার পায়ে ধরবার জন্য ব্যাকুল ভাবে ইঙ্গিত করছে !

সবিনয়ে বললাম, আপনি কি বলতে চাইছেন বাবা ?

বলতে চাইছি তুমি আমার বংশকে কলঙ্কিত করেছ,—শ্রীযুক্ত দীননাথ চৌধুরীর কণ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে উঠ্‌ল,—তুমি আমার পিতৃপিতামহের নরকবাসের ব্যবস্থা করেছ !

মাথা হেঁট ক'রে বললাম, আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

বুঝবে কেমন ক'রে ? সৃষ্টি করবার শক্তি নিয়ে তোমরা আসোনি, সমাজকে সৎভাবে লালন করবার শিক্ষা তোমাদের নেই, তোমরা এসেছ ধ্বংস করতে। তুমি এমন কাজ ক'রে এসেছ সোমনাথ, যে আমাদের সমস্ত গ্রাম স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মানুষের মনে এই চমক

লাগাবার বাহাদুরির তলায় তোমার কি ছিল জানো,—যৌবনকালের কুৎসিত কুপ্রবৃত্তি!

মাথা আমার হেঁট হয়েই রইল। বাবা বলতে লাগলেন, এটা তোমার কল্‌কাতার শিক্ষা কিন্তু দেশের শিক্ষা নয়। তোমার সম্বন্ধে আমাদের অন্য ধারণা ছিল। ভেবেছিলুম তুমি বুঝি নিজের চরিত্রকে বড়ো ক'রে তুলতে পেরেছ, বুঝি মানুষ হয়ে উঠেছ,—আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আজ—আজ আমি চেয়ে দেখি, গোপনে গোপনে তোমার চরিত্রে সর্ব্বনাশের বারুদ জমে উঠেছে, তোমার মধ্যে আমাদের কল্যাণ চিন্তা নেই, সমাজের শুভচিহ্ন নেই। এর চেয়ে তোমার মরণ ভালো ছিল সোমনাথ। —তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌ল।

প্রতিবাদ কিছু করবার আগেই তিনি বললেন, আমার সন্তান বলে তুমি আর পরিচিত হবার চেষ্টা ক'রো না। আমার বংশের স্বভাবকে তুমি কলুষিত করবার জন্য দাড়িয়ে উঠেছ, তোমার প্রকৃতির মধ্যে পাপ বাসা বেঁধেছে। আমি ক্ষমা করব না তোমাকে।

আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। বললাম, কিন্তু—

না, কিন্তু নয়। তোমার পক্ষে অন্য বিচার আমার আর নেই। তোমাকে স্বীকার করব না এই তোমার শাস্তি। তুমি যাও সোমনাথ, দেশ থেকে দূর হয়ে যাও, সমাজের প্রাণধর্ম্মকে বিষাক্ত করেছ, তুমি আমাদের সকলের শত্রু!

দুখীরাম ওদিকে কান্নাকাটি স্বরু করেছে। তার দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, আমার কথাটা শুনুন?

উচ্চকণ্ঠে বাবা বললেন, আপোষ কিছু নেই, তোমার ঘটনা নিয়ে মজলিশ বসাতেও চাইনে!

কিন্তু আমি কি করেছি বললেন্ না ত ?

হঠাৎ চক্রবর্ত্তী এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, এমন প্রবৃত্তি কি ভালো সোমনাথ ? তুমি আমাদের গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, সমাজের মুখোজ্জ্বল করেছিলে, ব্রাহ্মণের সদ্বংশের সন্তান। তোমার কি উচিত হয়েছে ভগবতীর হাত ধ'রে চলে' আসা ? সেই মেয়ে, যার মা সন্তান ঘরে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ? সবাইকে ত্যাগ ক'রে নিজের লজ্জা নিয়ে তুমি কী সুখে থাকবে সোমনাথ—বলতে বলতে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। এ যেন একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র, একটা চক্রান্ত! কিন্তু আমার কৈফিয়ৎ শোনবার ধৈর্য্য পর্য্যন্ত যাদের নেই, ভয় তাদের আমি করব না। ভয় ক'রে এসেছি আজীবন, ভয়ের মধ্যে আমরা মানুষ, ভয় আর অপমান আর অধীনতায় আমরা শৃঙ্খলিত, জর্জ্জরিত!

উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে বললাম, কিন্তু আমি জানি আমি কোন অন্যায় করিনি।

বাবা বললেন, তোমার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি শোনবার সময় আমার নেই। আমি জানাতে চাই এখন থেকে তুমি কি করবে।

সে আমি নিজেই জানিনে।

তিনি বললেন, আজ তোমাকে আমার সঙ্গে গ্রামে ফিরে যেতে হবে এবং চিরদিনের মতো কল্‌কাতায় আসা বন্ধ করতে হবে। সেখানে সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে এবং প্রায়শ্চিত্ত করবে। এখন থেকে আমার ব্যবস্থা অনুযায়ী তোমাকে চল্‌তে হবে।

স্পষ্টকণ্ঠে তাঁর মুখের উপর ব'লে দিলাম, যদি পারেন আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু আপনার এই ব্যবস্থা আমি মেনে নিতে পারব না।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, চক্রবর্ত্তী ?

চক্রবর্ত্তী মশাই এসে দাঁড়াতেই তিনি পুনরায় বল্‌লেন, দুখিরামকে ব'লে দাও আজ আমাদের যাওয়া হবে না !—আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন, আজ থেকে আমি অস্বীকার করব যে তুমি আমার সন্তান, এবং তুমিও যদি পারো তবে সমস্ত সম্পর্ক মুছে দিয়ো।

সর্ব্বশরীর আমার কাঁপছিল। আমার দুরন্ত প্রাণধারা থর থর করছে স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতি গ্রন্থিতে, জীবনচেতনার উদ্দাম ব্যাকুলতা। সংযত কণ্ঠে বললাম, আমাকে তবে বিদায় দিন্‌?

তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন, দুর্ব্বল পিতার অন্ধ বাৎসল্য আমার কাছে আশা ক'রো না। বিদায় আমি তোমাকে দিচ্ছিনে, বিদায় তুমি নিজেই নিলে। কিন্তু তোমাকে মেনে নিয়ে আমি দেশের নীতিকে আঘাত করব না, বিষাক্ত করতে পারব না সমাজের মনকে, তুমি যাও। আমার রক্ত আছে তোমার মধ্যে এজন্য আমি লজ্জিত। তুমি চ'লে যাও।—থাক্‌; পা ছুঁয়ো না আমার, আশীর্ব্বাদ তোমাকে করতে পারব না, তোমার দীর্ঘ জীবনের কামনা করতে পারব না এই মুখে। কেবল বলি, যে আঘাত তুমি দিয়ে গেলে, এর প্রতিফল যেন তোমার সমস্ত জীবনকে ধ্বংস করে। যদিন বাঁচবে, দুঃখ যেন তোমার আকণ্ঠ হয়ে ওঠে, বিপদের আঘাতে প্রতিদিন ছিন্নভিন্ন হোয়ো—

চক্রবর্ত্তী তাঁকে থামাতে এলেন, আর সবাই ছুটে এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়াল। কিন্তু পিতৃদেব নিরস্ত হলেন না, অগ্নি-সংযুক্ত

বারুদের ন্যায় রক্তাক্ত চক্ষে মূর্তিমান অভিশাপের মতো তিনি আবেগভরে বলতে লাগলেন, অপমানে যেন তোমার মাথা হেট হয় চিরদিন, অভাবে-দারিদ্র্যে নিজের বুকের রক্ত যেন তোমায় খেতে হয়,—জ্বালায় আর যন্ত্রণায় সংসারের সকল দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে তোমার প্রাণ যেন মরুভূমি হয়ে ওঠে...যাও, এই আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুমি চলে যাও।

কান্নায় আমার চোখ কাঁপছে, কান্নায় কাঁপছে আমার সর্ব্বশরীর, কাঁপছে আমার প্রাণের মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত। ক্ষমা চাইব না, দেবো না কৈফিয়ৎ, চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ব না আজ তাঁর পায়ে। কেবল একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। খুঁজে খুঁজে বা'র করলাম সদর দরজাটা, পথের দিশা আমার হারিয়ে গেছে,—হাতড়ে হাতড়ে রৌদ্রক্লিষ্ট পথে নেমে এলাম, চোখ দুটো তখন আমার উত্তপ্ত অশ্রুতে ঝাপ্সা হয়ে গেছে।

কোথায় ছিল দুখীরাম, ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়াল। ফিরে দেখি তার হাতে দুটো মিষ্টি আর এক ঘটি জল। বললে রোদ্দুরের দিন দাদাভাই এই জল খাবার টুকু···

না, না, জল নয়, সান্ত্বনা নয়, বুক আমার ফেটে যাক, তৃষ্ণায় বিদীর্ণ হোক! কোনো দিকে আর না চেয়ে আমি দ্রুতপদে রাজপথের উপর দিয়ে ছুটে চললাম।

২

লক্ষ্যহীন হয়ে রাস্তায় ছুটছি। রক্তের সঙ্গে রক্তের যে বন্ধন ছিল এতদিন, আজ যেন সমস্তটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কেন যে বার বার চোখে জল আসছে তা বেশ জানি। অন্যায় অবিচার পেয়েছি ব'লে নয়, জগতে একমাত্র পরমাত্মীয়কে হারালাম বলে নয়, কিন্তু আজ সত্যি বিচ্ছেদের আঘাত বুকে বাজল—সেই কারণে। উদার ঔদাসীন্যে সবাইকে মন থেকে ত্যাগ করেছি বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আজ নাড়িতে যখন টান পড়ল তখন চেয়ে দেখি, রক্তের বন্ধন কত জটিল। অশ্রু সম্বরণ করতে করতে প্রথমেই মনে হোলো, অনন্ত শূন্যের দিকে কে যেন আজ অকস্মাৎ প্রচণ্ড টান দিয়ে আমাকে ছুড়ে দিল, কোথাও আর কোনো অবলম্বন নেই।

মুখের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ ছুটে আসছে, সেটা বোধ হয় কান্নার, প্রাণের একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ। বোধ হয় এই কথাটাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি, পিতা, তোমার এই সর্ব্বোত্তম অভিশাপ যেন মাথায় নিয়ে চলতে পারি। তোমার দয়া ভিক্ষা নিয়ে তোমাকে যেন কোনদিন অপমান না করি।

কিন্তু এবারে কোন্ দিকে যাব? এ যে অবারিত মুক্তি, ছায়ালেশ-হীন অনাবৃত রিক্ততা! স্থায়ী আশ্রয় একটা বাঁধা ছিল বলেই যেখানে সেখানে এতদিন বেপরোয়া ঘুরে বেড়িয়েছি, পড়াশুনো করেছি, ভাবের স্রোতে গা ভাসিয়েছি, নানা তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি, কিন্তু বাঁচতে হয় কেমন ক'রে তা ত' কই শিখিনি। জীবন-সংগ্রামের একটা

অত্যন্ত স্থূল সমস্যা এই রৌদ্রক্লিষ্ট পথের উপর এক বিরাট ক্ষুধার্ত্ত মূর্ত্তি নিয়ে এসে দাঁড়াল—জীবনবিধাতার বক্র বিদ্রূপের মতো।

তা হোক্‌, মান্‌ব না শাসন, মান্‌ব না স্নেহ, স্বীকার কর্‌ব না এই তাসের দেশের সংরক্ষণশীলতাকে,—পথ আমাদের আলাদা। সে পথ নিশ্চিন্ত অনড় পল্লী পার হয়ে এসে মিলেছে দেশের দিকে, দেশ উত্তীর্ণ হয়ে এক বিস্তীর্ণ বিশাল মহাদেশের দিকে সে যাবে, আমরা যাবো প্রদীপ হাতে নিয়ে।

কখনো কুণ্ঠিত, ভয়ত্রস্ত, কখনো সাহসবিস্তৃতবক্ষ,—এমন অবস্থায় মেসে এসে পৌঁছলাম। কয়েকঘণ্টায় আমার যেন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। জামায়, কাপড়ে, হাতে, পায়ে যেন একটা অদ্ভুত দারিদ্র্যের ছায়া নেমে এসেছে। সঙ্গতিহীন শক্তিহীন একটা দারিদ্র্য। কোনোরূপে সকলের চোখ এড়িয়ে সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। এতদিন অনুভব করিনি, নিজেকে পরীক্ষা করিনি, ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্র ব'লে মনের কোন্ গোপনে সামান্য দম্ভ ছিল, বিলাসপ্রিয়তা ছিল, একটি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ছিল—কিন্তু আজ? ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত হলাম ব'লে স্বাভাবিক অস্থির ক্ষুধা জেগে উঠ্‌ল, অপ্রাকৃত অলৌকিক কামনা বুকের ভিতর পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। মনে হোলো, কিছুই আমার পাওয়া হয়নি, কিছুতেই আমার তৃপ্তি নেই। বাল্যকাল থেকে ঐশ্বর্য্যের আবরণে যে অসন্তোষ আমার মধ্যে চাপা ছিল, আজ সেই আবরণ স'রে যেতেই ভিতরের ভয়াবহ রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। ক্ষুধা, অনন্ত ক্ষুধা। অন্নের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধা। আমার বন্ধুরা—জগদীশ, গণপতি, লোকনাথ প্রভৃতি, দেবতার আকস্মিক অনুগ্রহে যাদের সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত হবার সৌভাগ্যলাভ ক'রে আজ ধন্য হলাম,

তারাও এই ক্ষুধার চক্ররেখায় দিনের পর দিন ঘুরপাক খেয়ে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হচ্ছে।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকালাম। মেসের ঠাকুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, চান ক'রে নিন্ বাবু, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, এই যাই।

ঠাকুর বললে, আপনি বারন ক'রে যান না, রোজই একবেলা আপনার ভাত ফেলা যায়, মিথ্যে পয়সা নষ্ট হ'লে আমাদেরও গায়ে লাগে বাবু। আপনাদের নিয়েই ত আমাদের—

বললাম, আচ্ছা এবার থেকে সাবধান হবো।

ঠাকুর আম্‌তা আম্‌তা ক'রে এবার আসল কথাটা বললে, ম্যানেজারবাবু বলছিলেন, এমাসে অনেক খরচা হয়েছে, কাল আপনার টাকাটা দেবার কথা ছিল, যদি এখন দেন—

বললাম, এখনই ঠিক দিতে পাচ্ছিনে ঠাকুর, তবে আজকালের মধ্যেই—ম্যানেজারবাবুকে বোলো যে—

আচ্ছা বাবু, তাই বল্‌ব। আপনি এবার চান্ করতে যান্, চৌবাচ্ছায় বোধ হয় জলও ফুরিয়ে গেল।

স্নান এবং আহারাদির পর বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপরাহ্ণে ঠাকুরকে একবার ডেকে পাঠালাম। লোকটা ঘুমচোখে উঠে এসে দাঁড়াল। বললাম, এই স্যুট্‌কেসটা নিয়ে চললুম ঠাকুর, শীঘ্র এখন ফিরতে পারব কিনা সন্দেহ, এই যা কিছু আসবাবপত্র আমার রইল সমস্ত বিক্রি ক'রে তোমাদের টাকাকড়ি তুলে নিয়ো ঠাকুর।

সে কি কথা বাবু? লোকটা পরিষ্কার চোখে তাকাল। আমি তার সঙ্গে পরিহাস করছি কিনা সে লক্ষ্য করতে লাগল।

হাঁ, টাকা আমার পক্ষে এখন দেওয়া কঠিন। শীঘ্র দিতে পারব ব'লে মনেও হচ্ছেনা। বুঝতে পেরেছ?

ঠাকুর চোখ কপালে তুলে বললে, এ যে অনেক টাকার মাল বাবু?

তা হোক, ওসব আর আমার দরকার নেই।

কিন্তু বিশ তিরিশ টাকার জন্য এত টাকার জিনিসপত্র ছেড়ে যাবেন?

বাকি টাকা তোমার কাছে রেখে দিয়ো, কোন এক সময়ে এসে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমি এখন চললুম।—ব'লে কোনো উত্তর এবং আলোচনা শোনবার আগেই স্যুট্‌কেসটা নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে নামতেই বাধা পড়ল। জগদীশ আর লোকনাথ হাসতে হাসতে আসছে। প্রথমেই আমার হাতের দিকে তাদের নজর পড়ল। কাছে এসে জগদীশ বললে, হাতে স্যুটকেস যে? আবার কোনো স্ত্রীলোককে নিয়ে পালাচ্ছিস নাকি রে?

তার সুন্দর হাসিতে মনের অবরুদ্ধ গ্লানি যেন একটি মুহূর্তেই হাল্‌কা হয়ে গেল। হেসে বললাম, রাজকুমার বিবাগী হয়েছেন। পিতার রাজ্য থেকে তাঁর চিরনির্ব্বাসন দণ্ড!

লোকনাথ আমার সব খবর জানে, তার মুখে চোখে নিরুপায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল। আমাকে সহসা সান্ত্বনা দেবার আর কোনো পথ না পেয়ে সে কেবল ভারি স্যুটকেসটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল।

পথে চলতে চলতে জগদীশ বললে, কুলে কালি দিয়ে এলেম তোমার রস আর রসদের টানে, হে প্রাণবল্লভ, তোমার বিহনে যে

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আর ঠাঁই পাব না। আমাদের উপায় ?

সকলের হাসিতে পথ মুখরিত হতে লাগল। হাসি থামলে সকল কথা বললাম। জগদীশ বললে, একটা মেয়ের জন্যে এই কাণ্ড ? হায়রে জাতও গেল, পেটও ভরল না! এখন কোথায় যাবি ? চল্ আপাতত স্যুটকেসটা ওখানে রেখে আসবি। ভয় পাসনে, আয়।

জগদীশ থাকে তার এক ছাত্রের বাড়ীতে। দুটি ছোট ছোট ছেলেকে পড়ানোর বিনিময়ে তার আহার এবং বাসস্থান জুটে যায়। ভোর বেলা মাত্র ঘণ্টা দুই সে ছোট ছাত্র দুটিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। লোকনাথের আড্ডা তার এক দূর সম্পর্কের মাসির ওখানে, সেখানে বন্ধুবান্ধবদের যাতায়াতের ভারি অসুবিধা। ডাকতে গেলেই মাসি তেড়ে এসে বলেন, বেনোজল ঢুকে বেড়াজল টেনো না বাবা; তোমরা ভবঘুরে, কাজকর্ম্ম নেই, আমার বোনপোটার মাথা খাও কেনগো ?

অতএব, সে-দরজাও বন্ধ। সত্য কথা বলতে কি, কোন গৃহস্থই আমাদের স্থান দিতে রাজি নয়, আমাদের ভিতরে নাকি বন্যার উন্মাদনা আছে।

জগদীশের বাসা হয়ে যখন আমরা পথ ধরলাম, তখন বিকেল হয়েছে। রাজপথ অগণ্য লোকের ব্যস্ততায় মুখরিত। জানি আমার সদ্য আপতিত দুর্ভাগ্যের জন্য জগদীশ আর লোকনাথ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে চলেছে, তাদের মুখে সান্ত্বনার কোন ভাষা নেই। তারা জানে জীবনসংগ্রামের প্রকৃত চেহারাটা, তারা জানে দারিদ্র্য, তারা জানে অন্নহীনের যন্ত্রণা। আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে একসময় করুণ রসিকতা করে' জগদীশ বললে, সোমনাথ. বাবার সঙ্গে

মনোমালিন্য করবার আগে নতুন একজোড়া জুতো আদায় ক'রে নিতে হয় রে !

বললাম, চলো জগদীশ, সবাই মিলে কাজ খুজে বেড়ানো যাক্। বাঁচতে হবে ত ?

তুই বড়লোকের ছেলে, কি কাজ জানিস ?

কিছু না জানি কুলিগিরিও ত করতে পারব ?

লোকনাথ এইবার বিদীর্ণ হয়ে উঠ্ল। বললে, নন্‌সেন্স্, কুলিগিরি ক'রে ভদ্রঘরের ছেলেকে যদি বাঁচতে হয় তবে আত্মহত্যা করা ঢের ভালো।

জগদীশ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে বললে, কেন 'ডিগ্‌নিটি অফ্ লেবর্ !'

তোর মাথা !—লোকনাথ উচ্চকণ্ঠে বিকৃতমুখে বলতে লাগল, মাসির অনাদরের একমুঠো ভাত, অপমানের অন্ন সেও আমার ভালো, কিন্তু—কিন্তু মজুরি আমরা করতে পারব না জগদীশ। কি জন্যে সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মেছি, কি জন্যে শিখেছি লেখাপড়া, কি জন্যে আমাদের শিক্ষা আর রুচি উন্নত হয়েছে ? সে সব ভুলে গিয়ে সামান্য কুলির পেশা নিয়ে নিজের টুঁটি টিপে মারব ? জলাঞ্জলি দেবো সব ? বাজে কথা বলিসনে জগদীশ।

সামান্য কুলি বলছ কেন ? সবাই কি আমরা সমান নয় ?

না, সবাই সমান নয়। এটা তোমার ধারকরা পশ্চিমী বুলি। একজন কুলি নিতান্ত সামান্য জীব, সে কেবল কায়ক্লেশে নিজের গতর খাটিয়ে বাঁচে, সেটা নিতান্তই টিঁকে থাকা কিন্তু আমরা কি ঠিক তেমনি বাঁচাই বাঁচতে চাই জগদীশ, আমাদের জীবনে কি আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না ?—হঠাৎ সে গরম-গরম বক্তৃতা জুড়ে দিল,—মজুরি করে

বাঁচাটা ডিগ্‌নিটি অফ লেবর্‌ হ'তে পারে কিন্তু সেটা শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে খুব বড় পরিচয় হোলো না জগদীশ। একটা পিঁপ্‌ড়ে পর্য্যন্ত খাবার জিনিস আহরণ করে' এনে খায়, প্রকৃতি তাকে নিজের নিয়মে খাটিয়ে নেয়। কিন্তু—কিন্তু আমরা কি তাই পারি ? বেঁচে থাকা ছাড়া কি আমাদের আর কোন কাজ নেই ?

লোকনাথের উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে জগদীশ বলতে লাগল, এটা তোমার আভিজাত্যের কথা হোলো লোকনাথ।

লোকনাথ বললে, তার জন্যে লজ্জিত নই। শ্রেণীবিভাগ শেষ পর্য্যন্ত একটা থেকেই যায়। কেউ কাজ করে, কেউবা কাজের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ছাগলকে দিয়ে যব মাড়াবার চেষ্টা হলেই সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। আমাদের রক্তের ভিতর দিয়ে যে ভদ্রশিক্ষার ধারা বয়ে এসেছে দিনমজুরিটা তার স্বভাবের মধ্যে নেই। মাথায় মোট বয়ে বাঁচাটা আমাদের ভয়ানক অপমৃত্যু। যাক্‌ গে, এ আমি তোমাকে ভালো ক'রে বোঝাতে পারব না।

পথে হাঁটতে হাঁটতে জগদীশ বক্র কটাক্ষে হেসে বললে, সোমনাথ, শুন্‌ছিস ত লোকনাথের কথা ? এ সেই মানুষ, স্ত্রীর সঙ্গে যে নাটক ভাষায় চিঠি চালাচালি করে, যে-লোকটা স্ত্রীর চেয়ে বৌদিদির ভক্ত বেশি। তোর দিদি আর বৌদিদির সংখ্যা কতগুলো রে ? —ব'লে সে এগিয়ে এসে লোকনাথের কাঁধে হাত রাখ্‌লে।

লোকনাথ বল্‌লে, যাও এখন ইয়ার্কি করো না। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, একটা চাক্‌রি বাক্‌রি না হলে আর কিছু ভালো লাগছেনা ভাই।

কেন, তোর সেই দৈনিক খবরের কাগজের 'সাবএডিটারিটা' হোলো না ?

জানিনে, হয়ত হোতেও পারে। চারিদিকে শকুনির দল বসে আছে, তার মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। গোপনে সুপারিশ যোগাড় ক'রে বেড়াতে হচ্ছে।

কথা কইতে কইতে তারা চলছে, আমি আছি পিছনে পিছনে। ঠিক নেই কোন্‌দিকে চলেছি, উদ্দেশ্য নেই লক্ষ্য নেই। সান্ধ্যভ্রমণ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর, ভ্রমণ করি আমরা সারাদিন—জলে, রৌদ্রে, ঝড়ে, হিমে, বিশ্রাম নেবার অবকাশ আমাদের নেই। বিশ্রাম যখন নিই তখন আর উঠিনে, অনাসক্ত বীতশ্রদ্ধ বিশ্রাম। ভিতরে একটা অভাব রি রি করছে, বলতে পারিনে সেটা কী, বোঝাতে পারিনে ঠিক কী চাই, ঠিক কেমন করে বাঁচলে খুসি হই এ আমার জানা নেই। অনেকের অনেক জীবন কাহিনী পড়েছি, গল্পে উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করেছি, জীবন-বৈরাগীর নির্ব্বিকার নিরাসক্তির কথাও জানি, কিন্তু এই যে সম্মুখে বিপুল জীবনবাহিনী—এর ভিতর দিয়ে আমাদের কোন্ পথ? অন্ধকার অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে ভয় করে, জানিনে সেখানে কোন্ লিপি লেখা আছে! এ কথা মিথ্যা নয়, জনসাধারণের ভিতরে আমরা অসাধারণ। সবাই খুসি হয়ে গার্হস্থ্যের গণ্ডীর ভিতর স্বেচ্ছাবন্দী হয়, আমাদেরও তাই হবার কথা—স্ত্রী, সন্তান, অর্থ, যশ, আরামের সংসার,—কিন্তু তারপর?

কেবলমাত্র বাঁচা আর কেবলমাত্র মরা, এই কি শেষ কথা? মানুষের সমাজের চিরপ্রচলিত অভ্যাসের অনুকরণ করতে কিছুতেই মন উঠে না, সেই অভ্যাসকে নিষ্ঠুর উৎপীড়নে ভাঙবার জন্য আত্ম-বিদ্রোহ জেগে ওঠে। কানে এখনো ফুটছে পিতৃদেবের কথাগুলো, প্রাচীনের অচল জড়তার চেহারাটা যেন আজ প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

আমরা নতুন নই, নবীন। জীবন-নির্ব্বাহের অভ্যস্ত ধারাটার প্রতি নবীন মনের এসেছে সংশয়, এসেছে গূঢ় অবিশ্বাস। বর্ত্তমান যুগের অন্তরে যে সন্দেহের জিজ্ঞাসা বারে বারে ভেসে উঠেছে নবীন কালের মানুষ তারই প্রতিরূপ।

অকস্মাৎ নূতন গলার আওয়াজে চমক ভাঙ্‌ল। চেয়ে দেখি চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। একখানা মোটর কাছে এসে দাঁড়াল। ফিরে দেখি আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। জগদীশ আর লোকনাথ হেসে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাণীপদ তার গায়ের উড়ানি সামলে গাড়ী থেকে নামল। স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বললে, ভাগ্যি দেখতে পেলুম তোমাদের, আমাকে এমন দলছাড়া ক'রে দিলে কেন বল ত? তোমরা বেড়াও চাকরি খুঁজে, আমি বেড়াই তোমাদের খুঁজে।

তার সুন্দর হাসি, সুন্দর কণ্ঠ, সুন্দর আচার ব্যবহার। তার চেহারায় অভিজাত সমাজের পালিশ, পরিচ্ছন্ন তার সাজসজ্জা, ঝুমকো ফুলের গোছার মতো তার ঘন কালো চুল,—রেশমের মতো সেই চুলের ঐশ্বর্য্য ও শ্রী। বিশাল দুটি চোখ একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে ভরা, আপন গভীরতায় আত্মগত। সে এত সুন্দর বলেই আমাদের মধ্যে তার ঠাঁই নেই। কাছে এসে দাঁড়াল কিন্তু তার বলিষ্ঠ সুবিস্তৃত দেহটা আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠ্‌ল। শরীরের গঠনের আভিজাত্যটা তার যশ ও প্রতিষ্ঠার অনেকখানি সাহায্য করেছে। কোনো কোনো সাপ্তাহিক কাগজ বলে, বাণীপদ নাকি নবীন যুগের প্রতিভা।

জগদীশ বললে, সাহিত্যিক, তোমার রুচি আর সৌন্দর্য্যবোধ অত্যন্ত উঁচু সুরে বাঁধা, তোমার প্রকৃতি আর রসজ্ঞান পাছে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় তাই ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলি। কিছু মনে কোরো না।

বাণীপদ ক্ষমাসুন্দর হাসি হেসে বললে, মনে করাকরির কথাটা আপাতত চেপে রেখে দাও। অনেক সময় পাওয়া যাবে। এসো, কোন্‌দিকে যাবে বল ?

লোকনাথ বললে, তোমার পথে কি আমাদের নিয়ে যেতে চাও নাকি ? আমরা তোমার অনুসরণ করলে খুসি হ'ও ?

বাণীপদ বললে, এ ত' মন্দ নয়, আমার অবস্থাটা অভিমন্যুর মতো হয়ে দাঁড়াল দেখছি। কোথায় আমার অপরাধটা জমল বল দেখি ?

জগদীশ বললে, অপরাধ করোনি জীবনে এইটেই বোধ হয় তোমার বিরুদ্ধে এদের নালিশ। কুসুমাস্তীর্ণ পথ দিয়ে তোমার যাতায়াত তাইতেই বোধ হয় আমাদের রাগ। রাগ আর চাপা বিদ্বেষ।—ব'লে সে হেসে উঠ্‌ল।

আমি এবার বললাম, তোমার'কুঞ্জবন' গল্পটার খুব সুখ্যাতি হয়েছে চারিদিকে, ব'লে রাখি। গল্পটা প'ড়ে এই জগদীশই সেদিন তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাচ্ছিল। সত্যি, নতুন লেখকের মধ্যে তুমি অদ্বিতীয় !

বাণীপদ বললে, কেমন জগদীশ, মনে মনে সায় দিচ্ছ ত?

বরাবরই দিয়ে থাকি। জগদীশ বলতে লাগল, বিধাতার বরে তুমি একখানা আয়না পেয়েছ, তোমার সেই আয়নায় আমাদের রহস্যময় প্রকৃতির সত্য চেহারাটা দেখতে পাই, খুসি হয়ে বলি, তুমি দীর্ঘজীবি হও। কিন্তু তুমি কাছাকাছি এলেই মন বিরূপ হয়ে ওঠে, সুদূর ঔদাসীন্যের রাজ্যে তোমার বাস, অনেক চেষ্টাতেও আমরা সেখানে পৌছতে পারিনে। সকলের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ভেবেছ সকলকেই তুমি পাবে, কিন্তু পাওনি, আজ সবাই তোমাকে ত্যাগ করেছে।

বাধিত হলুম।—বাণীপদ বললে, এখন আমার ওখানে এসো, চা খাওয়াবো। মিষ্টান্ন না দিলে তোমাদের কণ্ঠ মধুর হবে না।

লোকনাথ বললে, ভয় করে ভাই বাণীপদ, তোমার সমাজে যাওয়া আমাদের অভ্যেস নেই। তোমার সমাজে সবাই তোমাদেরই উপগ্রহ, তারাও সব ছোট-বড়-মাঝারি বাণীপদর দল। কেতা-দুরস্ত মিহিচাল-চলনের সৌখীন সম্প্রদায়ের ঝাঁক। অতি ভদ্রতা আর অতিরিক্ত সহানুভূতি সেখানে আমাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে, গোপন তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাবে প্রকাশ্য আলাপের আতিশয্যে।

জগদীশ বললে, এমন সুবিধে আর কখনো পাইনি ভাই বাণীপদ, পথে একলা পেয়ে তোমাকে ঠুকে নিই। ভক্ত টক্ত কাছাকাছি কেউ এখন নেই তাই বাঁচোয়া। তোমার চেয়ে তোমার অনুচরেরা এককাঠি সরেশ,—বুঝতে পেরেছ ? তোমার একটা লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে সেদিন তাই দেখা গেল। নবীন লেখক তুমি, তাই তোমার ভক্ত কয়েকজন কাঁচা তরুণ। ব্রাহ্মসমাজের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন এক ছোক্‌রার সঙ্গে আমার প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম, সে জান্‌ত না আমি তোমার পরিচিত।

বাণীপদ প্রমুখ আমরা সবাই হাসছিলাম।

অবশেষে সকলে তার মোটরে উঠতে বাধ্য হলাম। জগদীশ হেসে বললে, এমন মোটরে আমাদের চড়বার কথা নয় বাণীপদ, চাপা যাবার কথা।

সোফার গাড়ী চালাল। পথ বেশি দূর নয়, বাণীপদর বাড়ী আমরা সবাই জানি, জানে অনেকেই, কিন্তু কোনদিন যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। না যাওয়ার কারণটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু যেতেও বাধে। আমাদের

সঙ্গে বাণীপদর যে প্রভেদ, সেটা যাতায়াতের দ্বারা সমান ক'রে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

তার বাড়ীর গেট্ পার হয়ে গাড়ী ভিতরে এসে দাঁড়াল। কলিকাতা শহরের এত গোলমাল এত আন্দোলন—সমস্তটা যেন বিশেষ একটি মন্ত্রের স্পর্শে সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হোলো এ বাড়ীটা যেন শহর থেকে, দেশ থেকে জনসাধারণের সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, এ বাড়ীর মানুষেরা যেন ভাবে-ভাসা রূপকথার বিচিত্র মানুষ, এরা খায় না, আমোদপ্রমোদ করে না, এদের নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনে কোথাও ঘাতসংঘাত নেই,—প্রথমদৃষ্টিতে এদের বিসদৃশ শান্তিপ্রিয়তাটাই কেবল চক্ষুকে পীড়া দিতে থাকে। পরস্পরের কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়ী থেকে নেমে আমরা অন্দরের দিকে চললাম, বাণীপদ আমাদের আগে আগে। দেউড়ির দারোয়ান সহসা উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকাল, সম্ভবত আমাদের লক্ষ্য ক'রে নয়। বাণীপদর গায়ের চাদরের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে বোধহয় এই কথাটাই ভাবছিলাম, আমাদের গায়ের জামা কাপড়গুলি এ বাড়ীতে প্রবেশ করবার উপযোগী নয়। আর একটু প্রস্তুত হয়ে এলেই ভাল হোতো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে দেয়ালের দুধারে নানা রকম ছবি টাঙানো। প্রাচীন শিল্পকলার অনুসারী সেই রহস্যময় চিত্রগুলির স্পষ্ট অর্থও আমরা জানিনে, চেয়ে চেয়ে একটি নির্ব্বোধ বিস্ময় জাগে। সেই ছবিতে মনস্তত্ত্বের জটিল অর্থভরা, আপাত দৃষ্টিতে যদি সেগুলো দুর্ব্বোধ্য মনে হয় তবে সেটা আমাদেরই বোধশক্তির অভাব ব'লে প্রতীয়মান হবে। তাদের নিয়ে আলোচনা করার সাহস নেই আমাদের।

বাণীপদর শিল্পজ্ঞান আমাদের বুদ্ধির এলাকার বাইরে। এদের শিক্ষার ধারার সঙ্গে জনসাধারণের মেলে না।

দোতলার চওড়া দালানে উঠে এসে আমরা দাঁড়ালাম। আমরা যেন কিছুতেই সহজ হতে পাচ্ছিনে, পায়ে আসছে জড়তা, জগদীশের মুখে পর্য্যন্ত কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে ওজন করা হাঁটা, ওজন করা চালচলন, কথাবার্ত্তায় চুলচেরা মাত্রাজ্ঞান, কেতাদুরস্ত ভাবভঙ্গী। বাণীপদ বললে, ঘরে বসবে তোমরা?

দালানের চেয়ে ঘর আরো ভয়ঙ্কর। সেখানে প্রত্যেকটি ছবি থেকে সামান্য আসবাবটি পর্য্যন্ত অটল নীরবতা নিয়ে যেন আমাদের চালচলন বিশ্লেষণ করবার জন্য উদ্যত। কোথাও যেন জীবনের সহজ অবলীলা নেই, একটি শ্বাসরোধ করা যন্ত্রণাদায়ক নিঃশব্দতা মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জগদীশ বললে, থাক্ বাইরেই বসি হে, এখানে হাওয়া আছে।

জগদীশ নিজেই অগ্রসর হয়ে একখানা মার্বল্ টেবিলের পাশে একখানা চেয়ারে ব'সে পড়ল, বসতে পেয়ে সে যেন অকূল সমুদ্রে কূল পেয়ে গেল। আমরাও তার দেখাদেখি গিয়ে দু'খানা চেয়ার দখল ক'রে বসলাম। লোকনাথ অন্যমনস্কে একবার পা তুলে বসতে গিয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে আবার পা নামিয়ে নিল। আর যাই হোক এখানে পা তুলে অশোভন ভাবে বসাটা চলবে না। পাশের চেয়ার খানা খালি রইল, সেখানায় হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য করা; এবং সেখানায় যে বাণীপদ এসে বসবে এতে আর সংশয় নেই। এই পার্থক্যটুকু বজায় রাখতে আমরা যেন বাধ্য হলাম।

বাণীপদ আমাদের রেখে ভিতরে গিয়েছিল, এইবার বেরিয়ে এসে

বললে, কিছু গানবাজনার আয়োজন ক'রতে ব'লে দিলুম, তোমাদের খানিকটা সময় যদি নষ্ট করি আপত্তি তুলবে না ত ?

তার কণ্ঠের মাধুর্য্য বিশেষ ক'রে আমাকে মুগ্ধ ক'রে দেয়। সকলের হয়ে জবাবটা এবার আমিই দিলাম, আপত্তি আর কি, রাত দশটা পর্য্যন্ত আমাদের কোনো কাজ নেই। দশটার পরে খাবার খুঁজতে যাই।

বাণীপদ ঠিক সেই চেয়ারখানাতেই এসে বসল। জগদীশ এবার বললে, সাহিত্যিক, আবার বলি তোমাকে দেখলে আমাদের ঈর্ষা হয়।

তেমনি করে বাণীপদ সুন্দর হাসি হাসল। বললে, বাড়ীতে এসেছ কি সেই ঈর্ষাটাই প্রকাশ করতে ?

হ্যাঁ, যতদিন তোমায় দেখব সেই ঈর্ষাটাই কেবল প্রকাশ ক'রে যাব বাণীপদ। তোমার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তোমার সাহিত্য, তোমার জীবন একই সূত্রে গ্রথিত। নিরবচ্ছিন্ন আকাশ, নিষ্কণ্টক সম্ভোগ— তোমার জীবনকে ফলে ফুলে বিকশিত করার মূলে এরা অক্লান্ত সাহায্য করেছে। অন্নবস্ত্রের দুঃখের ভিতর দিয়ে তোমাকে দাঁড়িয়ে উঠতে হয়নি, এইটি তোমার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় আশীর্বাদ।

বাণীপদ বললে, দুঃখের চেহারাটা কি কেবল বাহ্যিক জগদীশ ?

জগদীশ বললে, সাহিত্যিক, অনেক কথা আছে এ সম্বন্ধে, জানি দুঃখের চেহারাটা বাহ্যিক নয়, জানি অন্নবস্ত্রের অভাবটা বড় অভাব নয়, জানি প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামটাই সত্য নয়, লাভ ক্ষতি কলহ কলঙ্কটা বাঁচা ও মরার মাঝখানে শেষ কথা নয়—সবই জানি, কিন্তু— কিন্তু একটা জায়গায় সান্ত্বনার ভয়ানক অভাব ঘটে, সাহিত্যিক। কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ নিয়ে কোনোমতে যারা বাঁচে, অপমানের অন্ন খেয়ে

মনের দুঃখে যক্ষ্মায় ভুগে যারা মৃত্যুবরণ করে, হয়ত তাদের মধ্যেও তোমার মতো শক্তিধর প্রাণ ছিল, তারাও হয়ত একদিন দেশের আকাশে স্বর্য্যের মতো জ্যোতির্ম্ময় হয়ে প্রকাশ পেতে পারতো।

বাণীপদ বললে, বুঝতে পারলুম না, এটা কি আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ?

লোকনাথ হেসে বললে, অভিযোগ নয়, ঈর্ষা।

ঈর্ষার জন্ম প্রশংসায়। তোমাদের ঈর্ষা দেখে আমার ত খুসি হবার কথা!

আসরটা আজ দেখতে দেখতে বেশ জাঁকিয়ে উঠ্‌ল।

জগদীশ বললে, তোমাকে আমরা ভালোবাসি সাহিত্যিক, কিন্তু কাছে টান্‌তে গেলেই একটা দুর্ভেদ্য আবরণ সামনে টেনে দাও, তোমার সেই আবরণটাই তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার ডিগ্‌নিটি। তোমার ঐশ্বর্য্য দিয়েছে তোমার ব্যক্তিত্ব, আর শারীরিক গঠন ও রূপ দিয়েছে তোমার ডিগ্‌নিটি। জনসাধারণের মাথার ভিতর থেকে মাথা উঁচুতে উঠলেই সহজে পাওয়া যায় পূজা। পূজা তুমি এখনো পাওনি, পেয়েছ জনকয়েক ভক্তের বন্দনা। ভবিষ্যৎ তোমার অবশ্য আলোকোজ্জ্বল!

এমন অবস্থায় কথায় বাধা পড়ল। আমাদের সকলেরই চোখ পড়ল দরজার দিকে। ভিতর থেকে একটি তরুণী বেরিয়ে এলেন পরণে রক্তবাস,—তাঁর পিছনে পিছনে একজন চাকরের কাঁধে জলখাবার ইত্যাদির ট্রে। লোকনাথ চমৎকৃত হয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। তরুণীটি কাছাকাছি আসতেই বাণীপদ সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে, ইনি হচ্ছেন শ্যামলিকা দেবী।

চমৎকার নামটি ত আপনার ?—লোকনাথ একটু অধীর হয়ে তারিফ ক'রে উঠ্‌ল।

শ্যামলিকা স্নিগ্ধহাস্যে লোকনাথের অভিনন্দনটুকু গ্রহণ করলেন, বললেন, আপনাদের জন্য কোকো তৈরী করেছি, অসুবিধে হবে না ত ?

জগদীশ হেসে বললে, কিছুমাত্র না, কেবলমাত্র গরম জল হোলেও চ'লে যেত !

তার কথায় আমরা সবাই হাসলাম, শ্যামলিকা হাসলেন, এবং সেখানে কোনো মৃতদেহ পড়ে' থাকলেও জগদীশের কথায় না হেসে থাকতে পারত না। এই মেয়েটি এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ বাতাসটা ঘুরে গেলে। তাঁর আভায় আমরা যেন সবাই আলোকিত হয়ে উঠলাম। অসাধারণ তাঁর সাজসজ্জা, এবং তাঁর সেই পরিপাটি প্রসাধন এড়িয়ে সর্ব্বপ্রথমে মাথার এলো-খোঁপায় গোঁজা রক্ত গোলাপটি আমাদের চোখে পড়ল। লোকনাথের একাগ্র দৃষ্টি যেন অবশ হয়ে গেছে, ভদ্রসমাজের বিচারে তার চাহনিটা হয়ত কিছু পরিমাণে অশোভন, অসঙ্গত—কিন্তু সৌন্দর্য্যোপলব্ধির যে পরম আন্তরিকতা তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি হঠাৎ লোকনাথকে আড়াল ক'রে উঠে দাঁড়ালাম, জায়গা ছেড়ে দিয়ে বললাম, আপনি বসুন।

শ্যামলিকা বললেন, এখুনি আসছি, এসে বসব।—তারপর বাণী-পদর দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, ফোন্ ক'রে ওদের ডাকলুম, ওরা গেছে বেরিয়ে, কি করা যায় ?

বাণীপদ বললে, তুমি গাইবে, গলা ভালো আছে ?

দু'একটা গাইতে পারি।—ব'লে চাকরের হাত থেকে ট্রে-টা

টেব্‌লের উপর নামিয়ে শ্যামলিকা সন্দেশের রেকাবগুলি একে একে সাজিয়ে রেখে চলে' গেলেন।

আবার যেন সবটা অন্ধকার হয়ে গেল। লোকনাথ চোখ নামিয়ে নীরবে বসে রইল। জগদীশ বাতাসটা ফিরিয়ে দিল। বললে, সাহিত্যিক, তোমার রচনা কিছু প'ড়ে শোনাও, অনেকদিনের সাধ।

নতুন ত কিছু লিখিনি জগদীশ!

পুরানো লেখাই শোনা যাক্।

আমি বললাম, আমি তোমার আবৃত্তির বিশেষ অনুরাগী।

বাণীপদ হেসে উঠে ঘরের ভিতরে গেল। জগদীশ কৌতুক ক'রে বললে, আমাদের কলেজের সতীকান্তর কথা মনে আছে সোমনাথ? তার কবিতা শোনানোর বাতিকটা কী পীড়াদায়ক! রাস্তার লোক ডেকে খাবার খাইয়ে কবিতা শোনাত, একবার শোনাতে আরম্ভ করলে আর থামায় কার সাধ্য!

লোকনাথ বললে, শেষকালে চোখ টেপাটিপি ক'রে নানা অছিলায় পালিয়ে আত্মরক্ষা! হতভাগার এতটুকু মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

আমি বললাম, কিন্তু খাওয়াত খুব।

জগদীশ বললে, ওটা ঘুষ।

লোকনাথ বললে, কবিতা কিন্তু ভালো লিখ্‌ত যাই বল!

তা বললে কি হয়, ভালো সন্দেশও বেশি খেলে এক সময় পেট হাঁসফাঁস করে। ধরে বেঁধে যারা রচনা শোনায় রসিক সমাজে তারা উপেক্ষিত।

এমন সময় বাণীপদ একখানি খাতা হাতে নিয়ে এসে বসল। মরক্কো বাঁধাই সুন্দর একখানি খাতা, পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য, এ যেন তারই যোগ্য। খাতাখানি খুলে সে বিনা ভূমিকাতেই একটি কবিতা তার

স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি ক'রে যেতে লাগল। তার কণ্ঠে একটি নিবিড় প্রাণের উত্তাপ মাখানো।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম। প্রদীপ্ত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তার রচনা যেন সোনার সূতায় গাঁথা। তার শক্তির তুলনায় পাঠক-সমাজে তার প্রসিদ্ধি যথেষ্টই অল্প বলতে হবে। সমস্ত রচনাটির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে যেন একটি পরম আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হচ্ছে, তার সহজ ও প্রশান্ত ভাষার ভিতর দিয়ে যেন একটি বেগবান রসতরঙ্গ আমাদের হৃদয়ের তটে এসে আঘাত করতে লাগল। বাণীপদ সেই জাতীয় সাহিত্য রচনা করে, যা পাঠককে সাধারণ চিন্তার স্তর থেকে ঊর্দ্ধলোকে নিয়ে চলে, ভাবের গভীরতা আনে চিত্তে, রসলোকের দিকে উন্মনা মন প্রসারিতপক্ষ হয়ে উড়ে চলে' যায়।

আবৃত্তি থাম্‌ল। আমরা যেন কেউ কারুকে আর চিনতে পাচ্ছিনে, এমনি অভিভূত হয়ে গেছি। আলো পড়েছে আমাদের মনে, আলো দেখছি চারিদিকে। কিয়ৎক্ষণের জন্য আমরা যেন উচ্চতর জীবন লাভ ক'রে ধন্য হয়ে গেছি! লক্ষ্যই করিনি ইতিমধ্যে কখন্ চাকর এসে কোকো-র বাটি সাজিয়ে দিয়ে গেছে। বাণীপদ এবার স্নিগ্ধ হেসে বললে, সন্দেশগুলো অবাক হয়ে তোমাদের ঔদাসীন্যের দিকে চেয়ে রয়েছে হে।

এতক্ষণে যেন আমাদের চমক ভাঙল। সবাই সোরগোল ক'রে খেতে বসে গেলাম। খাওয়া আরম্ভ করতেই নারীকণ্ঠের গান এল কানে। মনে হোলো, রূপার ঘুঙুরের আওয়াজ। রাত্রির ওই দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকার যেন হঠাৎ করুণকণ্ঠে কথা কয়ে উঠ্‌ল। সম্মুখের ওই ফুলবাগান, কৃষ্ণচূড়ার গাছ, নিঃশব্দ প্রহরীর মতো এই চক্‌মিলানো বাড়ীর বড় বড় থাম, দূর আকাশের ওই নক্ষত্রনিচয়, দেওয়ালে টাঙানো

এই রহস্যময় চিত্রগুলি, এদেরও যেন একটি রূপবান ভাষা আছে। আমরা কোথায় আছি, কি করছি, কি ভাবছি, কিছুই আর ঠিক রইল না। অপলক চক্ষু, রুদ্ধকণ্ঠ, অবশ দেহ, অবসন্ন মন,—কেবল সর্ব্ব-শরীরের ভিতরে একটা অস্বাভাবিক রক্ত চলাচলের শব্দ অনুভব করতে পারছিলাম। ওই মেয়েটির নামই জেনেছি মাত্র, কিন্তু পরিচয় জানতে পারিনি। বাণীপদর স্ত্রী নেই, তার ভগ্নিকেও আমরা চিনি,—শ্যামলিকা হয়ত কোনো আত্মীয়া হবেন। কিন্তু আত্মীয়া যদি নাও হন্, কেবলমাত্র তিনি যদি বাণীপদর অনুপ্রাণনার অবলম্বনও হন্ তাতেও কোনো কথা নেই। তাঁর সুর-প্রতিভার অলোক-সামান্য শক্তিকে আমরা সবাই মনে মনে সকৃতজ্ঞ প্রণতি জানালাম।

গান থামাবার পর কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলাম মনে নেই, হঠাৎ সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ শুনে সবাই মুখ তুলে তাকালাম। বঙ্কিম এক দৌড়ে উপরে উঠে এল।

হ্যালো, কবি? আরে, তোরাও হাজির যে সোমনাথ? বাস্‌রে, সন্দেশের এক্‌জিবিশন্। একটা ভারি দুঃসংবাদ আছে জগদীশ, এসে বলছি। শ্যামলি, শ্যামলি কই?—বলতে বলতে বঙ্কিম সোজা যে-ঘরে গান হচ্ছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। সকল সময়ে তার অবাধ প্রবেশ।

লোকনাথ হঠাৎ মুখের একটা শব্দ ক'রে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। কানের কাছে মুখ এনে বললে, এ আমার কিছুতেই বরদাস্ত হবে না সোমনাথ। ওই রাস্কেল্‌টার বেপরোয়া রোমাণ্টিক পোজ্‌টা আমি চিনি, সব ওর শয়তানি, সব মেয়েকে ও হাতে রাখতে চায়!

জগদীশ বললে, থাম্ লোকনাথ, স্ত্রীর চিঠির গল্প এখানে করিস্‌নে। হ্যাংলা কোথাকার!

লোকনাথ সন্ত্রস্ত হয়ে বসল। বাণীপদ হেসে বললে, এই বঙ্কিম একটা পাগল, বুঝলে লোকনাথ। রাশ ছিঁড়ে দৌড় দিয়েছে সমাজের ওপর দিয়ে। সমাজ-বিদ্রোহী সাহিত্যের আওতায় গড়ে উঠেছে ওর চরিত্র। মানে না নীতি, মানে না ধর্ম্ম, হৃদয়ের পথ দিয়ে চলে, বন্যার জলে ভেসে বেড়ায়, আকাশে প্রলয়ের ভ্রুকুটি দেখলে নেচে ওঠে ওর প্রাণ।

লোকনাথ বঙ্কিমের প্রতি এই প্রশংসাবাক্যে উত্যক্ত হয়ে উঠ্‌ল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, তোমার প্রশ্রয় পেলে ও আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে বাণীপদ।

থাম্ লোকনাথ। পরশ্রীকাতরতাটা ভদ্রভাষায় প্রকাশ করতে শেখ্।—জগদীশ ব'লে উঠ্‌ল সাহিত্যিক, কিছু মনে কোরোনা, লোকনাথটা ভদ্রসমাজের অযোগ্য, নিজের প্রকৃতিকে গোপন করতে জানে না।

লোকনাথ আহত হয়ে বললে, আমি কি তাই বলছি...তোমার এক কথা জগদীশ। সমাজে যখন রয়েছি একটা নীতি মেনে চল্‌তে হবে না? তুমি কি বলতে চাও অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতাকে সায় দিয়ে যাবো?

জগদীশ এবার হাসল। লোকনাথের পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, কিন্তু নিজের যেখানে অক্ষমতা, আশা চরিতার্থ করা যখন সাধ্যাতীত, তখন সেই গাত্রদাহ নিয়ে সাধুতার ভান করা অন্যায়। ও মেয়েটি তোমার কে হন্ বাণীপদ?

বাণীপদ বললে, কেউ হন্ না। এমনিই আমার এখানে থাকতে উনি ভালোবাসেন। আমার কাকার এক বন্ধুর মেয়ে। এবারে এম-এ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

লোকনাথ বললে, বঙ্কিমের মতো বন্ধু জুটলে পরীক্ষায় পাশ করা কি আর সম্ভব হবে?

বাণীপদ হেসে বললে, তা বটে। এই দ্যাখোনা, বঙ্কিম এত দুরন্তপনা করে এখানে, কিন্তু কখন্ নিঃশব্দে যে সে শ্যামলিকার হৃদয় জয় করেছে আমি বুঝতেই পারিনি। আমি প্রায় বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠ্‌ছি।

এত সহজ তাহার কথা, এত স্পষ্ট যে, অতি উদারপন্থী লোকও এখানে থাকলে নির্ব্বাক হয়ে যেত। লোকনাথের চোখ দুটো দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগল। জগদীশ অলক্ষ্যে তার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, সাহিত্যিক, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের প্রতি তোমার একটা স্বাভাবিক মমত্ববোধ দেখে আসছি। তুমি ফ্যাশনেব্‌ল পাড়ার লোক, জানিনে তোমার পূর্ব্বজীবনটা কি ধরণের। তোমার গল্প আর উপন্যাসগুলোর মধ্যে যৌনদুর্নীতির প্রতি একটি সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। সুন্দর ভাষা আর মনোরম লিখনভঙ্গির আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি ছেলেমেয়েদের দুর্নীতির দিকে ঠেলে দাও। তোমার আর্টের বাহাদুরি এইখানে।

আমি ত জানিনে জগদীশ, কি লিখি আমি!

জানো তুমি, সেই কথাটাই আমি বল্‌ব। তোমার মধ্যে একটি রসের প্রকৃতি রয়েছে সেটা অত্যন্ত দেহলোলুপ। রসের পাক দিয়ে সেটাকে মনোহর ক'রে তোলার শক্তি আছে তোমার। সাহিত্যিকরা অত্যন্ত স্বার্থপর জীব, নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য তারা জীবনকে নিয়ে খেয়ালের খেলার মত নাড়াচাড়া করে। স্ত্রীলোক তাদের কাছে আত্মবিকাশের উপকরণ মাত্র, কেবলমাত্র প্রয়োজন। তারা মানেনা স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব, স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য। যখন খুসি গ্রহণ করবে, যখন খুসি করবে বর্জ্জন। সাহিত্যিক, এ কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো,

যারা সত্যি আর্টিস্ট্ তারা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। তোমরা স্নেহহীন, তোমরা দয়াহীন। তোমার মনে বিদ্বেষ আসবে না, কারণ মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার কোনো সামাজিক দায়িত্ববোধ নেই। স্ত্রীলোক থেকে রসের আনন্দ লুণ্ঠন ক'রে নিলেই তোমার কাজ ফুরোয়, তুমি তাকে দূর ক'রে দাও। কিন্তু—কিন্তু সংসারে দুঃখ পায় এই বোকা লোকনাথরা—যারা মেয়েদের সম্মান দিতে যায়, ভালোবাসতে যায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছুটোছুটি করে। মানুষ হিসাবে সমাজে তোমার চেয়ে এদের মূল্য বেশি।

এমন সময় বঙ্কিম ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ ভিতরে শ্যামলিকার সঙ্গে কী নিয়ে যেন তার একটা অস্ফুট বচসা আমাদের কানে আসছিল, সেটা অনুমান করা কঠিন। এবার সে তাড়াতাড়ি এসে পকেট থেকে পাটকরা একখানা বাঙলা দৈনিক কাগজ টেব্‌লের উপর রেখে বললে, খবর তোরা কিছুই রাখিসনে দেখছি। কালির দাগ দেওয়া আছে, পড়্ সোমনাথ।

সকলে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। কাগজখানা হাতে নিয়ে খুঁজে খুঁজে কালির আঁচড়কাটা সংবাদটার দিকে চোখ পড়ল। কয়েক ছত্র পড়তেই মুখ দিয়ে আমার একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কি? কি খবর সোমনাথ?

জগদীশ কাগজখানা তাড়াতাড়ি নিয়ে চোখ বুলাতে লাগল, এবং তন্মুহূর্ত্তে সেও চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, রঘুপতি আত্মহত্যা করেছে। গণপতির ছোট ভাই।

সবাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বঙ্কিম বললে, গত পরশু তারিখে

এই ঘটনা। চাকরি একটা জুট্‌ল না তার, শেষ পর্য্যন্ত দারিদ্র্য আর সহ্য করতে পারল না। একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে, ভারি করুণ চিঠি।

লোকনাথ বললে, আমরা ত কিছুই জানতে পারিনি!

বঙ্কিম বললে, আমিও জানতে পারিনি। আজ সকালে গিয়ে পড়েছিলুম গণপতির ওখানে, দেখি পোষ্টমর্টেম্‌ পরীক্ষার পর লাস বার করলে গণপতি...আমাকে দেখে বললে, বঙ্কিম, ভাই মরেছে পরে কাঁদব, এখন পোড়াবার খরচ পাই কোথায়?—যাই হোক, সন্ধ্যার সময় আমরা শ্মশান থেকে ফিরলুম।

বাণীপদ নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে রইল। লোকনাথ কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ চক্ষে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, আমাকে—আমাকে ক্ষমা করিস বঙ্কিম, অনেক গালাগাল দিয়েছি তোকে। তুই সেখানে না থাকলে গণপতি হয়ত—

এবং তারপর কান্না সে আর সামলাতে পারল না; দেশ-কাল-পাত্র ভুলে গেল, ভুলে গেল শ্যামলিকা হয়ত এখুনি এসে পড়তে পারেন,—আমার হাত ধরে বালকের মতো বলতে লাগল, তোরা জানিসনে সোমনাথ, কত দুঃখে দুর্দ্দিনে কত বড় বন্ধু রঘুপতি আমার ছিল জীবনে সে কোনোদিন অন্যায় করেনি। চরিত্রের দিক থেকে সে যে কত বড়···কেবল আমিই জানতুম—

পাথরের মত সবাই নির্ব্বাক ও নিঃশব্দ।

আমি ধীরে ধীরে তার হাতটা ছাড়িয়ে বারান্দার একান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাণীপদ লোকনাথের পিঠের উপর হাত রেখে বললে, বলবার কথা গেল ফুরিয়ে, কী বললে তোমাদের দুঃখের লাঘব

হবে তা জানিনে। ওঠো লোকনাথ, সংসারে অনেক দুঃখ আছে, আছে অনেক অমঙ্গল—অনেক অভিশাপ—আর...

জগদীশ এইবার হঠাৎ বারুদের মতো জলে উঠ্‌ল,—সান্ত্বনা দিচ্ছ সাহিত্যিক? পাথরের পাঁচিলে কী দুঃখে দরিদ্র মাথা ঠুকে নিজেকে শেষ ক'রে দেয় তা তুমি কোনদিন জেনেছ? সান্ত্বনা! কাব্যের ভাষায় আজ তুমি আমাদের সান্ত্বনা দিতে এসেছ! ভদ্র সন্তান, শিক্ষিত যুবক,—উদরান্ন সংস্থান করবার জন্য যারা শহরের মরুভূমিতে লালায়িত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তোমাদের অট্টালিকার নিচে বসতে গিয়ে যারা দারোয়ানের বিদ্রূপ সহ্য করে—সাহিত্যিক, তাদের প্রতিদিনের গভীর আত্মগ্লানির ভাষা কি তোমার কলমের মুখে ফুটে উঠেছে কোনোদিন? থামো, সান্ত্বনা দিয়ো না!

বাণীপদ অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আমাকে ভুল বুঝোনা জগদীশ, আমি—

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো জগদীশ অল্প একটু জায়গার মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। বললে, সোনার সুতোয় চিন্তার বিলাস গেঁথে ফিরি করাই তোমার পেশা, বর্ষা আর বসন্ত নিয়ে তোমার রসের খেলা, প্রেমের সাহিত্য নিয়ে আর্টের কেরামতি দেখানো তোমার কাজ, বর্ত্তমান কালকে বাদ দিয়ে চিরন্তন কাল নিয়ে তোমার টানা-হেঁচড়া,—সাহিত্যিক, তুমি জানো না মানুষের প্রয়োজনের কাছে এ সব অতি তুচ্ছ।—এই ব'লে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হোলো।

লোকনাথ বসে পড়েছিল, আবার উঠে দাঁড়াল। সজল চোখে সেও জগদীশের পক্ষ নিয়ে বললে, তোমাকে আক্রমণ করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তোমার দৃষ্টি কেবল এইদিকে ফেরাবার চেষ্টা করছি। তুমি শক্তিমান, একদিন জাতি হয়ত নিজের কথা তোমার মুখ দিয়ে

প্রকাশ করবে, তুমি হয়ত সবাইকে একদিন টেনে তুলবে—সবই জানি; কিন্তু আজকের এই অন্যায়, এই উৎপীড়ন, এই বর্ব্বরতা, এই শৃঙ্খলাবদ্ধ দারিদ্র্যের উপরে তোমার প্রবল ভাষাকে চালনা করছ না কেন? শাণিত তরবারির মত ঝক্‌ঝকে, উজ্জ্বল বিদ্রূপ তোমার কলমে নেই কেন? দলদর্পী দাম্ভিকের বিরুদ্ধে তোমার জ্বালাময় শাসনের বাণী ছুটে যায় না কেন, সাহিত্যিক?—বলতে বলতে সে হাঁপাতে লাগল।

বঙ্কিম ইতিমধ্যে কখন পালিয়েছে। বাণীপদ বিমূঢ়ের মতো একখানা ছবির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। জগদীশ থেমে বললে, চলো লোকনাথ, আর দাঁড়াবার সময় নেই। সোমনাথ, আয় রে—বলতে বলতে সে আর একবার বাণীপদর দিকে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল, সাহিত্যিক, জানি তুমি সব পারো, সে শক্তি তোমার মধ্যে যথেষ্টই আছে—কিন্তু তুমি প্রকাশ করতে ভয় পাও, তোমাদের ফ্যাশনেব্‌ল্ পাড়ার দার্শনিক ঔদাসীন্যের পাশে রয়েছে একটা চাপা ভীরুতা,—সেটা তোমাদের লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয়! চোখ চেয়ে যেদিন দেখবে, দেখতে পাবে জনসাধারণকে কৃপার চক্ষে দেখতে গিয়ে জাতির কাছে তোমাদের চরিত্রগত ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্ স্নবারি কৃপার বস্তুই হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, আসি আজকের মতো।

লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে জগদীশ দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। বাস্তবিক, রঘুপতি ছিল তার বড় প্রিয়।

বাণীপদ কাছে এসে কাঁধের উপর হাত রেখে ডাক্‌ল, সোমনাথ?

বুঝতে পারলাম, চোখের জলে আমার মুখ ভেসে গেছে, জামার হাতায় মুখ মুছে বললাম, ওদের কথায় তুমি কিছু মনে ক'রো না বাণীপদ। বন্ধুর বুকের রক্তে আমাদের চলবার পথ লাল হয়ে উঠেছে,

নিষ্ফল উত্তেজনায় তাই আমরা তোমাকে আঘাত ক'রে গেলাম। ক্ষমা কোরো।

বিদায় নিয়ে নামবার সময় বাণীপদ একপ্রকার মলিন রহস্যময় হাসি হেসে বললে, তবু একথা স্পষ্ট করেই একদিন তোমরা বুঝবে, মানুষের কোন দুঃখই মানুষ ঘোচাতে পারে না। দুঃখের পথই মানুষের পথ।

আমি দ্রুতগতিতে বন্ধুদের অনুসরণ করলাম। এখনই গণপতির ওখানে আমাদের সবাইকে যেতে হবে।

পথে নেমে এসে তিন বন্ধুতে মিলিত হলাম। রাস্তা যেন আর চিনতে পাচ্ছিনে। জগদীশ কথা বলছে না, লোকনাথও নীরব। কথা বলবারও আর কিছু নেই। যে-মৃত্যু আমাদের ভিতরে ঘটে গেল এ কেবল সকরুণ দারিদ্র্যের কথাই জানিয়ে গেল, এই-ই আমাদের পরিণাম। আমাদের এই-ই পথ।

কয়েকদিন ধরেই আমরা রঘুপতিকে খুঁজছিলাম। সেদিন বেলেঘাটা রেল-লাইনের ধারে তাকে শেষ দেখেছি। অত্যন্ত করুণ এবং কুণ্ঠিত মুখ। অতি দুঃখে, অতিরিক্ত কষ্টে বাল্যকাল থেকে লেখাপড়া শিখেছিল। কলেজে ভর্ত্তি হোলো, কিন্তু মাসিক বেতন জোটাতে পারল না ব'লে বি-এ পাশ করার আশা তাকে ছাড়তে হোলো। আশা ছিল তার অনেক। সে বড় হবে, বড় হয়ে আর সবাইকে বড় ক'রে তুলবে। বড় ভাইয়ের অন্নে প্রতিপালিত, গণপতির সংসারে একটানা অভাব,—লজ্জায় রঘুপতি আর মাথা তুলতে পারত না। এদিকেও ছিল তার নানা কাজ। বারোয়ারির চাঁদা তোলা, মড়া পোড়ানো, লাইব্রেরীর বই সংগ্রহ করা, সাহায্য-সমিতির জন্য মুষ্টিভিক্ষা আদায় ক'রে বেড়ানো,—সেছিল নানা কাজের মানুষ।

জগদীশ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল —তোরা কোন্ দিকে যাবি রে সোমনাথ?

তার গলার আওয়াজটা ভারি। লোকনাথ আমাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলে না কিন্তু সে নিরর্থক দৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে চলতে লাগল। তার পায়ে যেন আর আগল নেই। হঠাৎ রঘুপতির মৃত্যুটা তাকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে।

বললাম, গণপতির ওখানে যাবে না?

জগদীশ লোকনাথের পথের দিকে তাকিয়ে বললে, গিয়ে আর কি হবে, কেবল ভিড় বাড়ানো। হয়ত এখনো সবাই কান্নাকাটি করছে সহানুভূতি প্রকাশ করতে যাবো?—হঠাৎ সে ম্লান হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে, মনে হোলো অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করছে,—বললে, আমি গিয়ে এখন শুয়ে পড়বো রে, আর কিছু পারব না। ভালো কথা, লোকনাথকে পৌঁছে দিয়ে তুই কিছু খাবার কিনে তাড়াতাড়ি আশ্রমে চলে' যা—বুঝলি? খাস কিছু কিনে, কেমন?

বললাম, আচ্ছা। কিন্তু কাল তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে কখন্?

হবেই একসময়। ব'লে জগদীশ একপ্রকার উদাসীন হয়ে এক-দিকে চল্‌তে লাগল। মৃত্যু—মৃত্যু আজ আমাদের ভিতরে যেন কেমন একটা গভীর সন্ন্যাস এনে দিয়েছে। আমাদের সকলের জীবনের শিকড় শিথিল হয়ে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি লোকনাথকে ধরবার জন্য চললাম। কিছু দূর এসেও কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না, কোথায় সে ছিট্‌কে রাত্রির অন্ধকার ও পথের জনতার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে! এ-পথ ও-পথ অনেকদিকে ঘুরলাম, কিন্তু সে-পাগল কোন্ পথ দিয়ে কোথায় পালাল, এই রাতে তাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব।

হয়ত সারারাত্রি ধরেই সে আজ হাঁটতে থাকবে। লোকনাথকে আমি জানি।

অগত্যা তার আশা ত্যাগ করতে হোলো। ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম। ফিরবার মুখে হঠাৎ একস্থানে দাঁড়িয়ে দেখি, মায়ের বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। ওদিককার ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। সদর দরজা তখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। আজকের রাতটা এখানে থেকে গেলে মন্দ কি! একটুখানি আরামে আজ নিদ্রা দেবার জন্য সমস্ত মন লালায়িত হয়ে উঠেছে।

ভিতরে ঢুকে যে ঘরখানা আমাদের কারো কারো জন্য নির্দ্দিষ্ট সেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে আলো নেই, কিন্তু কলিকাতার রাজপথে এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও যা দেখতে পাওয়া যায়নি, এতক্ষণ পরে ঘরের একান্তে দক্ষিণের জানালাটার কাছে সেই অতি ক্ষীণ চন্দ্রালোকটুকু দেখা গেল। অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বিছানার উপর উঠে আমি সটান্ শুয়ে পড়লাম। বন্ধুর মৃত্যু গভীর অবসাদ এনেছে মনে।

চোখ বুজে হয়ত কিছু ভাবছিলাম, হয়ত বা চোখে তন্দ্রাই নেমে আসছিল, সহসা দপ ক'রে আলো জ্বল্‌তেই জেগে উঠলাম। দেখি ভগবতী সুমুখে দাঁড়িয়ে। বললাম, কি মিনু, এখনো ঘুমোওনি যে?

ভগবতী বললে, এই শুতে যাচ্ছিলুম সোমনাথদা। তখনি দেখলুম, কে যেন ঢুক্‌ল। আমি ভাবলুম আর কেউ। আপনি যে তিন চারদিন আসেননি?

এমনি। নানারকম কাজ। তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে?

মন্দ না। বেশ ভালোই আছি এখানে।

মা ঘুমিয়েছেন?

তাঁর ঘুমোতে এখনো অনেক দেরি। রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত জেগে তাঁর পড়াশুনো করা চাই। দেশের কোনো নতুন খবর নেই সোমনাথদা?

বললাম, বাবা এসেছেন। আজ সকালে গিয়েছিলুম তাঁর কাছে। সঙ্গে এসেছেন চক্রবর্ত্তীমশাই আর দুখীরাম।

ভগবতী দরজার কপাটে হাত রেখে ভীতকণ্ঠে বললে, তারপর?

তারপর সাধারণত যা ঘটে তাই ঘটেছে মিনু। তিনি আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। জীবনে আর কেউ কারো মুখ দেখব না।

ভগবতী ঢোক গিলে বললে, আমি যে আপনারই সঙ্গে চ'লে এসেছি গ্রামের লোক জানল কি ক'রে?

সম্ভবত আমার পাল্‌কির বেয়ারারা ব'লে দিয়ে থাকবে। তা ছাড়া এসব খবর বাতাসে ভেসে কানে গিয়ে ওঠে মিনু।

আশঙ্কায় ও অনুশোচনায় তার চোখে জল এল। বললে, তাহলে এখন উপায় সোমনাথদা? আমার যা হয় তাই হবে কিন্তু আপনার এই অবস্থা আমার হাত দিয়ে হোলো?

তা হোলো কিন্তু তার জন্যে কিছু উপকার পেলাম মিনু। জানা গেল, আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এর জন্যে এতটুকু লজ্জিত হোয়ো না ভগবতী।

ভগবতী অধীর হয়ে বললে, এই সামান্য ত্রুটির জন্যে তিনি আপনাকে এমন অকূলে ভাসিয়ে দিতে পারলেন!

পেরেছেন ব'লে আমি গর্ব্বিত।—আমি বললাম, তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাস এবং নৈতিক আচারের এত বড় মহিমা যে, একমাত্র সন্তানও তুচ্ছ হয়ে গেল। আমি তাঁর দৃঢ়তাকে শ্রদ্ধা করি।

ভগবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে, এ বাড়ী থেকে আপনার আর কোথাও যাওয়া হবে না সোমনাথদা, আমি মা'কে বল্‌ব সব কথা। আর—আর আমাকে পর মনে করবেন না, আমার যা আয় আছে তাতে অনায়াসে আপনার আর আমার চ'লে যাবে

হেসে বললাম, বেশ ত, দরকার হলেই চেয়ে নেবো মিনু? আপাতত আমি কাজ একটা কিছু করবই।

মিনু বললে, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে, সারাদিন খাওয়া হয়নি ত? শিগগির এসে মুখ-হাত ধো'ন্ বলছি, আমার সব তৈরী রয়েছে।—বলতে বলতে সে দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেল। এখুনি গিয়ে সে হয়ত মা'কে খবর দেবে।

কিন্তু মিনু এটা লক্ষ্য করল না কোথা দিয়ে আসে, মানুষের মনে পরিবর্ত্তনের সুর, কোথা দিয়ে আসে ঝড়। অল্পক্ষণ মাত্র আগে যে আরামের লোভটুকু আমাকে টেনে এখানে এনেছিল, এই মেয়েটির স্নেহস্পর্শে আমার সেই লুব্ধ মন বিপরীত পথ ধরলো। সোজা উঠে দাঁড়ালাম। মনে হোলো, কেন এই ভিক্ষা, এই দৈন্য কেন? এই রাত্রি, এই আলো, আমার ক্লান্ত দেহ, অশান্ত মন, একটি তরুণীর ঐকান্তিক ঔৎসুক্য, সাদর সেবা—কিন্তু কে বলেছে আমার অবচেতনায় এদের প্রতি আমার গোপন আসক্তি জমা আছে? এরা আমার লোভের উপকরণ, কিন্তু এরা যে আমার কাম্য নয়!

সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠান পার হয়ে নিঃশব্দে পথে নেমে এলাম। কে যেন ঠেলে দিল, দাঁড়াবার উপায় নেই! মিনু আঘাত পাবে? পা'ক। আঘাত তাকে দেওয়া দরকার। ছোট জীবনের দৈন্য, বিনা মূল্যের সামান্য স্নেহ, তরুণীর অকিঞ্চিৎকর হৃদয়ের সুর,—

এদের নিয়ে ভুল্‌ব সব,—আমি কি ঠিক সেই স্তরে? জানি এ আমার গর্ব্ব নয়, এ আমার সংযমের বাহাদুরি নয়, স্ত্রীলোককে অকারণে তাচ্ছিল্য করবার মতো নারীবিদ্বেষ প্রচারের সুলভ ভণিতা আমার নেই, কিন্তু আমি জানি এরা আমাকে সঙ্কীর্ণ দিনযাপনের দিকে টানে, এরা আমার বড় জীবনের কল্পনাকে ব্যর্থ ক'রে দেয়, হেয় ক'রে তোলে; এরা গভীর তৃপ্তি দেয় না, এদের মধ্যে আমার আবাল্যের অপরূপ স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায়।

অনেক রাত হয়েছে, পথে লোক চলাচল কমে' এসেছে। লোকনাথকে খুঁজে পাবার জন্য তখনো মনে একটা চেষ্টা ছিল। কিন্তু খুঁজে তাকে পাবার কথা নয়। পা দুটো আপনা থেকে চলছে, এবং চলছে যেদিকে সেদিকে না গিয়ে আমার মনে স্বস্তি নেই। আজ রঘুপতির শবদেহটা ছাড়া আর কিছু আমার চোখে পড়ছে না।

খালের পুল পার হয়ে যে-পথটা সোজা রেল-লাইনের দিকে গেছে, সেই পথে কিছুদূর এসে বাঁ-হাতি সঙ্কীর্ণ গলিতে ঘুরলাম। সরকারি আলো একটিমাত্র, চাঁদের আলোও দরিদ্র পল্লীর উপর পড়ে না,—সেই আবছা অন্ধকারে চিনে চিনে গণপতির বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। গা ছম ছম করছিল, হয়ত কান্নাকাটি এখনো থামেনি। দরজার কাছে একটা কেরোসিনের ডিবে জলছে. সেই আলোয় দেখা গেল, পাশে কয়েকটা নিমপাতা, কতকগুলি কাঁচা মটর ডাল এবং পাশে একখানা মাটির সরায় কতকগুলো আংরা। কেমন ক'রে ডাকব তাই আকাশ পাতাল ভাবছি।

হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে উঠ্‌ল, এবং আমাকেই লক্ষ্য ক'রে

দূর থেকে ছুটে আসতে লাগল। তখনই দরজার কাছে ঘেঁষে কড়া নেড়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, গণপতি?

এই যে, যাই।

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গণপতি এসে দাঁড়াল। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে এসে আবার চলে' গেল। দুজনে মুখোমুখি,—প্রথমটা কি কথা বল্‌ব ভেবেই পেলাম না। পরে গণপতিই কথা সুরু করলে, একা এলি এই রাতে?

বললাম, এইটুকু ত পথ।

গণপতি বললে, তোকে বসাবার পর্য্যন্ত জায়গা নেই। আর বসেই বা কি করবি! মা এইমাত্র কান্নাকাটি ক'রে ঘুমিয়েছেন! চল্‌, তোকে একটু এগিয়ে দিই।

গলির পথ দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এলাম। বললাম, কখন্‌ ফিরলে শ্মশান থেকে?

সন্ধ্যেবেলা। উঃ ভাগ্যি বঙ্কিম এসে পড়েছিল সেই সময়। নৈলে টাকার জন্যে মুদ্দোফরাসের কাছে অপমান হতে হোতো। ভগবানকে ডাকছিলুম, দোহাই বাবা, সোমনাথটা যেন এসে পড়ে। শেষ মুহূর্ত্তে তোর বদলে এল বঙ্কিম। বাঁচলুম। আগে মড়ায় আগুন দিই, তারপর কান্নাকাটি! হতভাগা গলায় দড়ি দেবার চারিদিন আগে থেকে কিছু খায়নি!—বলতে বলতে গণপতির গলা বন্ধ হয়ে এল।

একটু থেমে আবার বললে, চিঠিতে কি লিখে রেখে গেছে জানিস? লিখেছে—'আফিডের পয়সাটা কিছুতেই জোগাড় করতে পারলুম না, নতুন লাক্‌লাইন্‌ দড়িরও অভাব, তাই কাপড় পাকিয়ে কাজ সারতে হোলো। মৃত্যুর দ্বারা আমি দারিদ্র্যের প্রতিবাদ ক'রে গেলুম। আত্মহত্যার জন্য লজ্জিত নই।'

গণপতির চোখে জল এল।

বললাম, এবার তুমি শুয়ে পড়োগে, আমি বেশ চ'লে যেতে পারব।

শোন্, শোন্ সোমনাথ ; মৃত্যুর পরেও ভগবান যে বিদ্রূপ করতে পারেন মানুষের প্রতি, সেই কথাটাই তুই চুপি চুপি শুনে যা।

দরিদ্রের ভগবান নেই গণপতি!

আছে, আমি বলছি আছে—গণপতি চোখ দুটো উজ্জ্বল ক'রে বলতে লাগল, কিন্তু সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যন্ত কুটিল। আজ দিল্লী থেকে রঘুপতির পুরোনো একখানা দরখাস্তর জবাব এসেছে, ভালো একটা চাকরি হয়েছে তার!

অ্যাঁ? কি বললে?

গণপতি অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে বললে, বলছি যে; আছে দরিদ্রের ভগবান, ভালো ক'রে দেখিস সোমনাথ, সে আছে, কিন্তু সে সাপের চেয়েও ক্রুর, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর!—ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে' গেল। চলে' গেল মাতালের মতো।

কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

এইবার আমার আশ্রম খুজে নেবার পালা। অনেক দূরে এসে পড়েছি, ঘণ্টাখ্যানেক না হাঁটলে আর আশ্রমে পৌছতে পারব না। কিন্তু ভিতরে কোথায় যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছি। সে যন্ত্রণা স্থান বিশেষে নয়, সে যেন সর্ব্বশরীরে, সমস্ত মনে, মর্ম্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। কেন আমি এত ক্লান্ত, কেন এত পরিশ্রান্ত? এদের মতো আমারও ত চলবার পথ আছে। অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভিতর দিয়ে, অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে,

এই ঈশ্বরহীন, সৌন্দর্য্যহীন, মনুষ্যত্বহীন জীবপ্রবাহের পাশ কাটিয়ে আমাকেও ত পার হয়ে যেতে হবে এই দীর্ঘপথ।

এই যে একটা শোচনীয় মৃত্যু ঘটে' গেল এর জন্য দায়ি কে? শিক্ষায় দীক্ষায় আমাদের যে রঘুপতি কম ছিল না, স্বাস্থ্য সামর্থ্য উৎসাহ যে কোনো নবীন যুবকের মতো তারো ছিল, তারো বুকে ছিল অনির্ব্বাণ আশা, সর্ব্বপ্লাবী প্রেম, মনুষ্যত্বের মহিমা— তার মৃত্যুর জন্য কেবল কি দারিদ্র্যই দায়ি? আত্মহত্যা সে করেছে, সে কেবল ক্ষুধার জন্যই নয়, দুনিয়ার সকলের সম্বন্ধে তার ছিল একটি নিগূঢ় অভিমান। তার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আজ যেন চোখে পড়ল, মানুষ মানুষের উপর অবিশ্রান্ত দস্যুপণা ক'রে চলেছে, আত্মাভিমানী ধনাঢ্যেরা শোষণ করছে সহায়হীন দুর্ব্বলকে জাতি প্রবঞ্চনা করছে জাতিকে। লোভে স্বার্থে, অন্যায়ে এই যন্ত্রজর্জ্জরিত সভ্যতা, মানুষের কলঙ্কলেখাঙ্কিত এই বর্ত্তমান যুগ—এ আমাদের চারিদিক থেকে মারছে। আদর্শবাদ গেল ভেসে, প্রাণধর্ম্ম গেল তলিয়ে, জীবনের নীতি গেল মুছে—এ কোন্ সর্ব্বনাশা দিন এল ঘনিয়ে? ক্ষুধা, কেবল স্থূল ভয়ঙ্কর ক্ষুধার চেহারা দিকে দিকে। এক বিরাটকায় ক্ষুধিত চণ্ডাল অলক্ষ্যে ব'সে ধারালো নখর দিয়ে বিংশ শতাব্দির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিচ্ছে!

এই বিশাল অন্ধকারের নিচে দিয়ে জনহীন পথে আমি একা চলেছি। প্রতিদিনের খানিকটা সময় আমি এমনিই একা। সমস্ত দিনের সকল কর্ম্মের অবসানে সবাই আপন আপন আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছে, এবার আমার সময় হয়েছে নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার। কী অসহায় আমি, কী দরিদ্র! নানা অহঙ্কার আছে প্রকাণ্ড চেহারাটায়, আছে নানা অভিমান, কিন্তু—কিন্তু সে আমার

সঠিক পরিচয় নয়। আপন শক্তিহীনতাকে আমি অত্যাশ্চর্য্য শক্তির দ্বারা গোপন ক'রে রাখি। সংসারে কিছুই আমি পেরে উঠিনে। অকর্ম্মণ্য আমি চেয়ে চেয়ে দেখে যাই সব, চোখে ছায়া পড়ে, চোখে পড়ে মায়া। সম্মুখে এই রুদ্ধশ্বাস অটল রাত্রির রূপ আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, তারায় তারায় বেজে ওঠে একটি অতি সূক্ষ্ম শব্দহীন সঙ্গীত, সকল আকাশ জুড়ে আমারই নিভৃত প্রাণের একটি মহিমান্বিত প্রশান্তির রূপ দেখতে পাই। অকস্মাৎ মনে হয়,—মনে হতে নিজের কাছেও বিস্ময় লাগে,—এই দুঃখ অভাব ও ব্যর্থতাময় জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে আমি যেন উধাও একাকী ছুটে চলে' যাই, সব থাকে পিছনে পড়ে, একটি সুদীর্ঘ নিঃশব্দ মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে নীড়সন্ধানী পাখীর মতো উড়ে চলে যেতে থাকি। শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সেই পাখীর পাখার তলায় পার হয়ে যায় প্রভাত, পার হয়ে যায় সন্ধ্যা—আলো এবং অন্ধকার ডিঙিয়ে অনন্ত দূরে অন্ধ হয়ে সে ছুটেছে।

নিজের ভিতরে যেন একটি নদীর প্রবাহকে অনুভব করি। পায়ের বাঁধন যেন শিথিল হয়ে যায়। অস্বাভাবিক বেগে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে যাই।

৩

নতুন বর্ষা নামছে। আকাশের প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে মেঘে মেঘে। কোমল কাজলের ছায়ায় রৌদ্রের দাহ কমে গেল। বাণীপদ কবিতা লিখতে সুরু করেছে। সম্ভবত তাকে কেন্দ্র ক'রেই ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটে।

দৈনিক কাগজের দপ্তরে লোকনাথ সহ-সম্পাদকের কাজটা পেয়েছে। প্রেস-টেলিগ্রামের বাংলা অনুবাদ করা তার কাজ, মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় কলমে তাকে রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখতে হয়। রাজদ্রোহ বাঁচিয়ে গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দেওয়ার তার হাত নাকি মন্দ নয়।

চাকরি হবার কিছুদিন পরে মাসিক বেতনের কিয়দংশ অগ্রিম নিয়ে লোকনাথ দেশ থেকে তার স্ত্রীকে এনেছে। থাকে পটলডাঙায় এক বস্তির ধারে দুখানা করোগেটের ঘর ভাড়া নিয়েছে। একদিন তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে স্ত্রীর হাতের রান্না খাওয়ালো। পল্লীগ্রামের মেয়ে, রান্না ভালোই জানে। কিন্তু তার স্ত্রীকে দেখে জগদীশ ভারি চ'টে গেল। অনুরক্ত স্বামীর মুখে স্ত্রীটির সম্বন্ধে নানা অতিশয়োক্তি আমরা দীর্ঘকাল ধরে শুনে এসেছি,—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা ইত্যাদি নানা ধারণা হয়ে আছে,—সেদিন দেখা গেল কিন্তু তার বিপরীত। নাম পুষ্পরাণী। সুন্দরী সে নয় কিন্তু খর্ব্বকায়া। দেহের অন্যান্য গৌরবের মধ্যে মাথায় চুল আছে অনেক।

সেদিন আমরা পাঁচ ছ'জন বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলাম। সবাইকে প্রথমে একসঙ্গে দেখেই পুষ্পরাণী চোখ টিপে পাশের ঘরে লোকনাথকে ডেকে নিয়ে গেল। চাপা তিরস্কার ক'রে বললে, এমনি কল্লেই কলকাতায় থাকা হয়েছে! এত লোককে খাওয়াবো কোথেকে শুনি? দেনা শুধবে কে?

লোকনাথ বললে, চুপ চুপ, কত আর খাবে ওরা? বন্ধু নিয়েই ত আমার সংসার!

তবে বন্ধুদের নিয়েই থেকো, আমাকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়ো।

আসবার সময় আমার বাবা কি ব'লে দিয়েছেন শুনি? ছেলেপুলে হ'লে মানুষ করতে হবে না?

ছেলেপুলে যেন না হয়! ব'লে লোকনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে সটান্ আমাদের মাঝখানে এসে ব'সে পড়ল। পুষ্পরাণীর মুখ তখনো আমরা দেখিনি, কেবল যাতায়াতের সময় তার কাপড়ঢাকা চেহারাটা লক্ষ্য করেছি। জানিনে দেখবার কোনোদিন প্রয়োজন হবে কিনা। দ্রষ্টব্য বস্তু সে নয়।

এর পরেও অন্নগ্রহণের জন্য আমাদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হোলো, যেমন করেই হোক বিনামূল্যে একবেলা খেতে পাওয়াটা আমাদের কাছে খুব বড় কথা। গৃহকর্ত্তা যখন ঠিক আছে, তখন গৃহিণীর অনাদরটা গায়ে না মাখলেও চলে। আদর-আপ্যায়ন কি আর সব জায়গাতে মেলে?

জগদীশ অস্বাভাবিক পরিমাণ আহার করতে লাগল, স্ত্রীলোকের হাতের রান্না পেয়ে সে যেন দীর্ঘদিনের ক্ষুধা মিটিয়ে নিচ্ছে। এক সময় লোকনাথের দিকে মুখ তুলে সে বললে, কই রে, তোর স্ত্রী আমাদের পরিবেষণ করলেন না?

বঙ্কিম বললে, আমরা যে সবাই ওঁর ভাসুর হই, সামনে বেরোবেন কেমন ক'রে?

পাশের ঘর থেকে পুষ্পরাণী কি একটা মুখের শব্দ ক'রে উঠ্ল। শব্দটা অত্যন্ত অশোভন এবং অভদ্র। লোকনাথের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এল। আমাদেরই পাশে বসে মাথা হেঁট ক'রে ভাতগুলো সে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

জগদীশের মুখে কৌতুক আর আনন্দউচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সে বললে, ভাসুর আমরা সবাই কিন্তু সুযোগ বুঝে তোর ত দেওর হবার অভ্যেস আছে বঙ্কিম!

বঙ্কিম বললে, সেটা পাত্র বুঝে, নৈলে বেকায়দায় পড়লে আমিও দিব্যি ভাসুর-মামাশ্বশুর সাজতে পারি।

সে দিন আহারাদির পর রাস্তার কলে আঁচিয়ে আমরা স'রে পড়েছিলাম। পথে বঙ্কিম একসময় হেসে বলেছিল, কিন্তু যাই বল, লোকনাথ যে বল্‌ত, ওর স্ত্রী সত্যি চরিত্রবতী তাতে আর সন্দেহ নেই। পরপুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখেন না।

পুষ্পরাণীর প্রথম দিনের ব্যবহারেই জগদীশ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছিল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, মুখ দেখতে গেলে দেখাবার মতো মুখও হওয়া চাই।

গণপতি এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটিও কথা বলেনি। এইবার বললে, খেয়ে দেয়ে এসে নিন্দে কেন জগদীশ? কারো কোনো অন্যায় হলেই তোমরা তাড়াতাড়ি শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠো. কেন বল ত?

জগদীশ বললে, সময় বড় অল্প, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। পুষ্পরাণীর কথা আজকেই মনে রাখ্‌ব, কাল আর তাকে নিজের মনেই খুঁজে পাব না।

তাকে নিয়ে এত আলোচনাই বা হয় কেন? এ কথা ত ঠিক, সে আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী?

আমার শ্যালকের স্ত্রী!—জগদীশ উত্তেজিত হয়ে বললে, এই হতভাগার.জন্যেই ত এত কাণ্ড। ও আমাদের ধারণাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে। স্ত্রীর নামে কতকগুলো বিশেষণ জুড়ে দিয়ে লোকনাথ তাকে একেবারে স্বর্গের দেবী বানিয়ে ছেড়েছিল, আজ দেখি দেবী আমাদের নিতান্তই মানবী। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আতিশয্য প্রকাশ করা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য।

অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনোরূপ বিরুদ্ধ আলোচনা

করা গণপতির রুচিতে বাধে। জগদীশের মন্তব্য শুনে সে চুপ ক'রে রইল।

সেদিন কি একটা ছুটি উপলক্ষে গণপতির আফিস নেই, তাকে যখন পাওয়াই গেল তখন দিনটা মন্দ কাটবে না। সে ছাড়া আমরা সবাই বিখ্যাত বেকার। লোকে যা বলে বলুক কিন্তু কর্ম্মহীনতাটাই আমাদের বিলাস। সত্যকারের স্বাধীন আমরাই। সংসারে কোনো দায়িত্বের বোঝা বহন করিনে। বিশ্বাস করিনে কিছু। নিজেদের জীবনকে পর্য্যন্ত আমরা মাঝে মাঝে বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দিই।

কথা হোলো, সিনেমায় যাওয়া হবে, একটা ভালো ছবি এসেছে। কিন্তু তার আগে অর্থসংগ্রহ করা দরকার। অর্থ দেবে কে? বাজারে আমাদের এমন কোনো ক্রেডিট্ নেই যে, গোটা দুই টাকা ধার পাওয়া যাবে। কিন্তু অর্থ আজ চাই-ই চাই। আজ আমাদের উদরান্নের যতখানি প্রয়োজন, ঠিক ততখানি প্রয়োজন সিনেমা দেখার। শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা হোলো, জীবনকৃষ্ণের কাছে গিয়ে মিথ্যা অজুহাতে উক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় করতে হবে। মিথ্যা বলতে বাধবে এমন কাপুরুষ আমরা নই।

এমন সময় বৃষ্টি নাম্‌ল। ভিজতে ভিজতে গিয়ে আমরা আশ্রমে উঠলাম। জগদীশ, বঙ্কিম, গণপতি আমাদের নতুন বন্ধু শম্ভু, মুণ্ডিতমস্তক প্রভাত এবং আমি। ভিতরে কি একটা গোলমাল চলছিল, সবাইকে ঢুকতে দেখে জীবনকৃষ্ণ তাদের থামিয়ে দিলেন। আমাদের দলটা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে।

গোলমাল এখানে নিত্যই একটা কিছু লেগে থাকে। তবু আজ-কেরটা একটু যেন অন্য ধরণের। ওদিকের ঘরের দরজার চৌকাঠে প্রিয়ম্বদা মাথা হেঁট ক'রে বসে রয়েছেন, আমাদের দেখেও তিনি মুখ

তুললেন না। বঙ্কিম তাঁর দিকে তাকিয়ে কেবল নিঃশব্দে একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমরা জানি, বঙ্কিমের সঙ্গে আগে প্রিয়ম্বদার কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল, সম্প্রতি কি একটা কারণে মনোমালিন্য ঘটেছে। কারণটা কি জিজ্ঞাসা করতে বঙ্কিম হেসে বলেছিল, ব্যাপারটা ঈর্ষা-মূলক, খুলে একদিন বল্‌ব ঘটনাটা। কিন্তু ঘটনাটা আর শোনা হয়নি। সংসারে এমন ঘটনা অনেক ঘটে যা শোনার চেয়ে অনুভব ক'রে নিলে গোপন তত্ত্বটা সহজে অনুধাবন করা যায়।

জগদীশ সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সটান ব'লে উঠ্‌ল, স্বামীজি, কিঞ্চিত অর্থের দাবি আছে। সেদিন চৌধুরী মশাই বজবজে হিন্দু-সভায় যে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন, তার গাড়ীভাড়াটা তিনি পাননি। আজ চেয়ে পাঠালেন।

আশ্চর্য্য মিথ্যাকথা সে ব'লে গেল, কোথাও বাধল না। আমরা হাসি চেপে সবাই ঘরে গিয়ে উঠলাম। জীবনকৃষ্ণ বললেন, আচ্ছা একটু অপেক্ষা করো, যাচ্ছি। ভালোই হোলো, ভাবছিলুম টাকাটা তাঁকে পাঠিয়ে দেবো।

জগদীশ নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যের সঙ্গে আমাদের কাছে এসে বসল। বললে, চুপ, যেন জানতে না পারে। পাঁচটা টাকা আজ ঠিক বাগাবো। ছ'টায় আরম্ভ, নয়?

শম্ভু বললে, হ্যাঁ। আমি আগে গিয়ে টিকিট করব।

বৃষ্টিটা কিন্তু থাম্‌ল না, ঝিম্ ঝিম্ ক'রে পড়তেই লাগল। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। পাঁচটি টাকার সুখস্বপ্নে আমরা সবাই মশগুল। একসঙ্গে এতগুলি টাকা আমরা অনেকদিন দেখিনি। গত কয়েকদিন বঙ্কিম আমাদের জন্য প্রচুর খরচ করেছে। আমাদের কাছে যেই আসুক তাকে কিছু অর্থব্যয় ক'রে যেতেই হবে। এদিকে মদ্যপান ও

কিন্তু তুমি যে ঠিক কী চাও তা আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না প্রিয়ম্বদা।

ভদ্রলোকের বক্তৃতাটা বোধ হয় একটু হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, প্রিয়ম্বদা চুপ ক'রে গেলেন।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, দেশের কাজে নামলে মেয়েদের এই বিপদই ঘটে। ঘরও টানে, দেশও টানে। বুঝতে পাচ্ছি অবিনাশবাবু, আপনার কিছু কিছু অসুবিধা হয়েছে।

প্রিয়ম্বদা বললেন, ঘরের টানাটানি কিছু কমলেই আমি খুসি হই। আমি কি চাই, একথা যারা আজো বুঝতে পারেনি তাদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাইনে। মানুষ দেশের জন্যে জেল্ খাটে কেন, কেন বক্তৃতা দেয়, কেন দল গড়ে!

সেনগুপ্ত বললেন, তুমি ত ঠিক দেশের স্বাধীনতা চাও না প্রিয়ম্বদা!

চাইনে? তার মানে! তুমি কি মোটর হাঁকিয়ে ঝগড়া করতে এলে আমার সঙ্গে? তুমি জানো দেশের চারিদিকে অসংখ্য লোক আমার মুখ চেয়ে থাকে? আমার মুখের একটি কথার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে?

গভীর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতায় আমরা প্রিয়ম্বদার কথা শুনছিলাম, মুণ্ডিতমস্তক প্রভাত আর শম্ভু মুগ্ধদৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়েছিল। গণপতি নির্ব্বিকার হয়ে শুয়ে তার অভ্যাসমতো ধূমপান করছে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখি, জগদীশ আর বঙ্কিম হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। তাদের হাসির একটু আওয়াজ বাইরে গেলেই আজ এখুনি একটা কেলেঙ্কারী হবে। দেশের লোক যদি প্রিয়ম্বদার মুখ চেয়ে থাকে, যদি উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর বাণীর অপেক্ষা করে তবে হাসবার কি আছে? আজ হয়ত আমরা কাছাকাছি

আছি বলেই এই নেতৃস্থানীয়া মহীয়সী নারীটিকে গোপনে বিদ্রূপ কচ্ছি,—তাঁর দেহ নিয়ে, তাঁর রাঙাপাড়-শাড়ী পরা নিয়ে, তাঁর কাঁধকাটা ব্লাউস ইত্যাদি নিয়ে,-এবং এমন কি, ছেলেদের কাছে তাঁর নিজেকে আকর্ষণযোগ্য ক'রে তোলার কৃতিত্ব নিয়ে আমাদের মধ্যে তামাসা চলছে,—কিন্তু একদিন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁর নামটাই ত সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে! আমরা সেদিন কোথায় ভেসে যাবো তার ঠিক নেই।

জগদীশ ও বঙ্কিম দুজনে নিঃশব্দে অশ্রান্ত হেসে চলেছে। এক সময় সেনগুপ্ত যখন গলার সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তখন তাদের হাসি থাম্‌ল। তিনি আহতকণ্ঠে বললেন, তাহলে বাড়ী কখন্ ফিরবে তার ঠিক নেই, কেমন? আমি কিন্তু এমন ক'রে আর পারিনে!

প্রিয়ম্বদা বললেন, আমি কি ফিরব না বলছি?

এর চেয়ে লোকে আর কেমন ক'রে বলে? বাড়ীতে থাকাটাই এখন তোমার অনুগ্রহ। মোটর আছে সঙ্গে, এখনই চল না? গেলে তবু ছেলেটাকে শান্ত করা যায়।

প্রিয়ম্বদা আপত্তি ক'রে বললেন, একেবারে কাজ সেরে যাবো। ছেলেটাকে চাকরের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত হয়!

সেটা কি আর সহজ? ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে। তার চেয়ে আমি বলি কি—

সেইটেই সহজ। ছেলেটাকে এনে দিক্। আমার এক জ্বালা হয়েছে ছাই। এদিকে ছেলে কাঁদবে, ওদিকে কাঁদবে সংসার,—ঘরের কোণে গিয়ে বসে থাকলেই সকলের সুবিধে, বুঝতে পেরেছি।

অবিনাশবাবু স্বামীজীর কাছে বিদায় নিয়ে আবার মসমস্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

জীবনকৃষ্ণ ডাকলেন, তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ওহে সোমনাথ?

জগদীশ সাড়া দিয়ে বললে ঘুমোলেই ভালো হোত স্বামীজি।

বঙ্কিম আর গণপতি শুয়ে রইল, আমরা বাকি চার জনে বাইরে উঠে এলাম। আশ্রমের ঘড়িতে দেখা গেল ছ'টা বাজে, টাকা নিয়ে ঠিক সময়ে সিনেমায় গিয়ে পৌছবার আর সময় নেই! বৌদিদির দিকে অলক্ষ্যে তাকিয়ে জগদীশ একবার ঠোঁট উল্‌টে হাসল।

স্বামীজী বললেন, প্রিয়ম্বদা তোমার ভক্তদের একটু চা ক'রে খাওয়াবে নাকি?

প্রিয়ম্বদা বললেন, মাপ করবেন. ওঁরা আমার ভক্ত নন্।

জগদীশ এবার সবিস্ময়ে হেসে বললে, সে কি বৌদি, আমি যে আপনার পরম অনুরাগী! আর এই সোমনাথ, লোকনাথের চেয়েও এ আপনার ভক্ত! দেখেছেন ত এর বসবার ভঙ্গীটা, ভক্ত হনূমানকেও হার মানিয়েছে।

বৌদিদির সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম। অবিনাশবাবুর জন্য যে গুমোটটা সৃষ্টি হয়েছিল, এবার সেটা গেল হাল্‌কা হয়ে। জগদীশ পুনরায় বললে, আমার কথাবার্ত্তায় হয়ত সব সময়ে একটা চাপা বিদ্রূপ প্রকাশ পায় হয়ত সেইটেই আমার চরিত্র। কিন্তু মনে রাখবেন বৌদি যা সত্যি ভালো আমি তার যোগ্য মূল্যই দেবার চেষ্টা করি।

প্রিয়ম্বদা বললেন, যা সত্যি ভালো তা আপনি না বুঝতেও ত পারেন!

বেশ ত, আপনিই বুঝিয়ে দিন্। আমি ছাড়াও ত আরো অনেক রয়েছে, ভালোটা তারাও ত বুঝে নিতে পারে বৌদি?

আপনি কি বলতে চান্ মেয়েদের স্বাধীনতার এই আন্দোলনটা কিছুই নয় ?

জগদীশ হাসল। হেসে বললে, আমরা গল্প করতে এসেছি বৌদি, তর্ক করতে নয়। তর্ক থাক্। আপনার সঙ্গে যেদিন কন্‌গ্রেস কমিটির আপিসে দেখা হবে সেদিন ঝগড়া করব। তবু এই কথাটা আপনাকে চুপি চুপি ব'লে রাখি, রাষ্ট্র-স্বাধীনতার দিকে এদেশের মেয়েদের ঝোঁক নেই।

উপস্থিত সবাই বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকাল। প্রিয়ম্বদা হঠাৎ কোনো কথা আর খুঁজে না পেয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, চা না খেলে দেখছি আপনার মাথা ঠাণ্ডা হবে না জগদীশবাবু।

জগদীশ বললে, মেয়েদের বিদ্রূপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু চা খাবার পরেও আপনাকে আর একটা কথা বলব বৌদি, অপরাধ নেবেন না।

সেটা তবে আগেই বলুন, সেই বুঝে আপনার চায়ে চিনি দেবো!

সেটা হচ্ছে এই, আপনারা দেশ নিয়ে মাতেননি, মেতেছেন হুজুগ নিয়ে। তাতে ফল ফলেছে ভালো, মেয়েরা পথে বেরিয়ে মনের মানুষ বেছে নেবার কিছু সুযোগ পেয়েছেন।

প্রিয়ম্বদা বললেন, অপনার এই অপমান মেয়েরা গ্রাহ্য করবে না।

অপমান ?—জগদীশ বিনম্র হাসি হেসে বললে, বিশ্বাস করুন, আমি মেয়েদের বড় ভালোবাসি। তারা যা আব্দার ধরে তাই যোগাবার চেষ্টা করি তাদের হাসি, কথা, চোখের চাহনি আমার বড় প্রিয়। তাদের পায়ে দাসানুদাস হয়ে থাকতে গভীর তৃপ্তি পাই। আপনিই বলুন ত, আপনারা খুসি না থাকলে কি আমাদের চলে ? কেমন দুর

সাজাবেন, ফুলের মালা তৈরী করবেন, মিষ্টি রান্না রেঁধে দেবেন, অসুখ করলে মাথার কাছে ব'সে—

সে দাসীবৃত্তির দিন গেছে জগদীশবাবু।

যায়নি বৌদি,—জগদীশ আবার হাসল,—চোখ খুললেই দেখতে পাবেন, আমরাই চেষ্টা করি মেয়েদের মুক্তি দিতে কিন্তু তারাই নিয়ত চেষ্টা করছে নিজেদের পায়ে বাঁধনের পর বাঁধন জড়াতে। বৌদি, তারা চায়না মুক্তি, তারা চায়না দেশ নিয়ে মাথা ঘামাতে।

প্রিয়ম্বদা ভ্রূকুঞ্চন ক'রে বললেন, তারা কী চায়?

জগদীশ বললে, তারা যা চায় তা আপনিও জানেন বৌদি। তারা 'বন্দে মাতরমের' ভিড়ে চাপা পড়তে চায় না, চাকুরি ক'রে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে তারা নিতান্তই বিমুখ, তারা কেবল একটু ভালো ক'রে নিজেদের ঘর বাঁচাতে চায়, কেবল চায় একটু সুস্থ হয়ে বাঁচতে আর কিছু না। বৌদি, এবারে দেখতে পেয়েছি আপনাদের আসল চেহারা! নিত্যকাল ধ'রে আপনারা ছুটছেন পুরুষের পেছনে পেছনে, চোখে কাজল মেখে, হাতে কাঁকণ প'রে—তাদের হৃদয় জয় ক'রে চলাই আপনাদের একটিমাত্র কাজ। ভালোবাসা ছাড়া আপনারা একটি দিনও বাঁচতে পারেন না, প্রিয়ম্বদা দেবী।

আপনার সাধুভাষায় বক্তৃতার ফাঁদে পা দেবোনা,—ব'লে প্রিয়ম্বদা চায়ের জল চড়াতে উঠে গেলেন।

তাঁর ফিরতে মিনিট পাঁচেক দেরি হোলো। ফিরে এসে আবার তিনি নিজের জায়গায় বসলেন। তাঁর মনের অশান্ত বিদ্রোহের কথাটা আমরা সবাই জানি। বাড়ীতে তাঁর মন বসে না, সন্তানের প্রতি নারীর যে স্বাভাবিক মাতৃস্নেহ, সে-বস্তু তাঁর ভিতর অনেক পরিমাণে কম। বয়স তাঁর পঁচিশের মধ্যেই। বয়েসের পার্থক্য হিসাবে

অবিনাশবাবু তাঁর পক্ষে সত্যই বেমানান! সন্তানটি হয়েছে রোগা ও রুগ্ন।

তিনি যে রূপবতী তা'তে আর সন্দেহ নেই। চোখ দুটি তাঁর দীপ্ত এবং প্রাণের কথায় পরিপূর্ণ! মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, বেণী বাঁধলে নিজের ভারেই চুলগুলি ভেঙে পড়ে। চওড়া রাঙা পেড়ে শাড়ী পরলে দেহের গৌরব লক্ষগুণ বেড়ে যায়। ভক্তগণ উপগ্রহের মতো তাঁর চারিদিকে ব'সে চক্ষু ভ'রে তাঁকে দেখতে থাকে। বাস্তবিক, অবিনাশ বাবু তাঁর স্বামী, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

জগদীশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া ইস্তক্ ঝগড়াই চলছে। ভালো কথা কি আপনার মুখে নেই জগদীশবাবু?

শম্ভু আর প্রভাত উঠে ভিতরে চ'লে গিয়েছিল। জীবনকৃষ্ণ তাঁর পুঁথিপত্রে মনোযোগ দিয়েছেন।

জগদীশ হেসে বললে, এর চেয়ে কিছু ভাল কথা আছে কিন্তু তা শুনলে আপনি আরো চ'টে যাবেন। তা ছাড়া গোড়াতেই যে আপনার সঙ্গে আমার মিল নেই বৌদিদি।

এবার আমি বললাম, মিলবে কোথেকে, যখন তখন মেয়েদের গালাগালি দিতে পারলে তুমি ত আর কিছু চাওনা!

প্রিয়ম্বদা বললেন, ঠিক তাই। ঠিক বলেছ সোমনাথ।

জগদীশ বললে, সে দোষ কি আমার? এত মুভ্‌মেণ্টে মেয়েদের সর্ব্বনেশে আত্মপ্রতারণা দেখলুম। তারা বললে, পুরুষের কর্ত্তৃত্ব আমরা মানব না। খুব ভালো কথা। কতকগুলা মহিলা-সমিতি তৈরি হোলো। চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এখানেও সেই একই কথা। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, দেশের কাজ ক'রে

পুরুষকেই তারা খুসি করতে চাইল। পুরুষ খুসি না হ'লে দেশপ্রীতি আর সমাজসেবা তাদের কাছে অর্থহীন।

নানা বাদানুবাদের পর সেদিন বৌদিদির হাতে সবাই মিলে চা খাওয়া গেল। বাদ পড়ল কেবল বঙ্কিম। এক সময়ে উঠে সে একটা ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে চ'লে গেল। প্রিয়ম্বদা কি জানি কেন তার দিকে ফিরেও চাইলেন না। উভয়ের এই মনোমালিন্যের রহস্যটা আজো আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। চা খাওয়া শেষ ক'রে আমরা উঠে পড়লাম।

বৌদিদি পিছনে পিছনে দরজা পর্য্যন্ত এলেন। বললেন, স্বামীজি এখুনি যাবেন একটা অসবর্ণ বিবাহ সভায়। আমি কি একলা থাকব? এত সকাল সকাল ত বাড়ী ফিরব না?

কেন?

যদি ফিরি তোমাদের অবিনাশবাবু হয়ত মনে করবেন, আমার আর কোন কাজকর্ম্ম বুঝি নেই।

জগদীশ হেসে বললে, আহা বেচারা অবিনাশবাবু! স্বামীর প্রতি আপনার এত তাচ্ছিল্য কেন বলুন ত?

প্রিয়ম্বদা সে কথা কানে না তুলে বললেন, স্বামীজীর না আসা পর্য্যন্ত আপনি থাকুন না জগদীশবাবু? ওঁর ঘণ্টা দুই মাত্র দেরি হবে।

বন্ধুদের ছেড়ে থাকব আপনার কাছে?

বাপরে এত ঔদাসীন্য সইবে না কিন্তু আপনার।

জগদীশ হেসে বললে, আচ্ছা আসব এখুনি।

আমি কিন্তু একলা রইলুম?

আসছি, আশ্বস্ত থাকুন।

অনেকদিন পরে আজ শ্যামবাজারের বাড়ীতে এসে উঠলাম। বর্ষার দিনে কোথায় যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করি। জলের ফোঁটা আঘাত করে আমার রক্তের মধ্যে, দিগন্ত পরিব্যাপ্ত কালো মেঘ দেখলে আমার ভিতরের প্রাণ চোখের তারায় উঠে এসে কাঁপতে থাকে।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, দুরবস্থার দাগ পড়েছে সর্ব্বাঙ্গে, ধীরে ধীরে ভিতরে এসে ডাকলাম, মা?

ভিতরের রোয়াকে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, তাদের একজন বললে, ওপরে যান্ না, মা আছেন।

বললাম, ভগবতী কোথায়?

তিনিও ওপরে, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। খবর দেবো তাঁকে?

না থাক্, আমিই যাচ্ছি।

ভিতরটায় ছাত্রী-মেয়েদের মহল, বাইরের অংশটায় মা থাকেন, এবং এইদিকটাতেই বাইরের লোকজন সাধারণত যাতায়াত করে; অন্দর মহলের সঙ্গে বাইরের কোনো সম্পর্ক নেই।

সুমুখের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। প্রথম ঘরখানায় মায়ের লাইব্রেরী, তারপর বারান্দা, বারান্দার ওপারে 'ভিজিটারদের' জন্য নির্দিষ্ট ঘর। সেই ঘর থেকে বঙ্কিমের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মৃদুকণ্ঠে সে রবিঠাকুরের লেখা একটি বর্ষার গান ধরেছে। তার গান শুনলেই আমি থম্‌কে দাঁড়াই। সুরের দেশের মানুষ সে, সুকুমার, তাকে আমরা সবাই ভালোবাসি।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিয়ে ঢুকলাম লাইব্রেরী-ঘরে। একখানা চৌকির উপরে শুয়ে একখানি বই হাতে নিয়ে মা'র চোখে তন্দ্রা এসেছে।

আমার পায়ের শব্দ হয়নি, নিঃশব্দে গিয়ে হেসে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম।

বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু কমই হবে। আমি জানি তাঁর স্বামি আছেন, কিন্তু তিনি কোথায়, মা তাঁর সঙ্গে একত্রে বসবাস করেন না কেন,—এ কথা তিনি কোনদিন উল্লেখ করেননি, আমরাও জানবার চেষ্টা করিনি। দু হাতে তাঁর মাত্র দু'গাছি সোনার চুড়ি, মাথায় এয়োতির চিহ্ন নেই। কেন নেই তা এ জগতে তিনি ছাড়া সম্ভবত আর কেউ জানে না। কখনো শাড়ী পরেন, কখনও পরেন ধুতি আবার কখনো হঠাৎ হাতের চুড়ি খুলে তাঁকে ধববেবে শাদা থান পরতেও দেখেছি। তাঁর মুখে চোখে কথায় বার্ত্তায় কোনোদিন কিছুই প্রকাশ পায় না, কিন্তু তাঁর পরিচ্ছদের আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে আমরা তাঁর মনের অবস্থাটা অনুমান করবার চেষ্টা করি। মানুষ অনন্ত রহস্যময়, তার প্রকৃত পরিচয় তার স্রষ্টারও অজ্ঞাত।

মা'র তন্দ্রা ভাঙ্‌ল। চেয়ে চেয়ে দেখে তিনি বললেন, ওমা, তুমি কখন্ এলে বাবা? মনে পড়ল এতদিন পরে? ধন্য ছেলে! ইস্, এমন মেঘ করেছে? একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল!—ব'লে তিনি বইখানা সরিয়ে উঠে বসলেন।

আমার না হয় এতদিন পরে মনে পড়ল, তুমিও ত খোঁজ নিতে পারতে?

কেমন ক'রে নেবো? মেসের একটা ঠিকানা ছিল তাও তুমি নষ্ট করেছ। এক লালদীঘির ধারে গিয়ে বসলে হয়ত কোনো কোনোদিন তোমার দেখা পাওয়া যায়!

কেন, আশ্রমে? ওখানে ত আমি প্রায়ই থাকি!

না বাবা, ও কথা বোলো না,—পাছে সেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে আমি—

কে তিনি মা?

ওই যে সেই মেয়েটি, সেই তোমাদের প্রিয়ম্বদা—ওরে বাবা! অমন মেয়ে আর দুটি চারটি বেড়ে উঠলেই দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

বললাম, এটা তোমার নিছক হিংসে মা, মেয়েরা মেয়েদের কৃতিত্ব কিছুতেই সইতে পারে না। তুমি ও কি স্বাধীন মেয়ে নও মা?
মা স্নিগ্ধ স্নেহের হাসি হাসলেন। বললেন, ওকে কি স্বাধীন বলে বাবা? ও যে ছুটেছে ভূতের তাড়ায়, প্রবৃত্তির খেয়ালে! যাক গে ওর কথা।—বলে তিনি একবার বাইরের দিকে তাকালেন, পুনরায় বললেন, বঙ্কিম এসেছে বুঝি? গলার আওয়াজ পাচ্ছি!

বললাল, হ্যাঁ। বর্ষার দিনে জলো গান ধরেছে।

মা বললেন, তোমাদের দলের ওই আর এক পাগল। সারাদিন কবিতা গান আর হুজুগ। পাগল ছেলেদের নিয়ে আমার ঘরকন্না। তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁর এই স্নেহের হাসিটিতে আমরা সব দুঃখ দুর্যোগ ভুলে যাই।

মিনুর কথা উঠ্‌ল। মা বললেন, বনের ফুল তুমি আমাকে এনে দিয়েছ বাবা। এমন সুবুদ্ধি মেয়ে, আমার সমস্ত সংসারটি মাথায় ক'রে রয়েছে।

বললাম, পড়াশুনোয় কেমন মনোযোগ?

যথেষ্ট। কোথাও ওর এতটুকু বাধেনি। একে বলি মেয়ে, নিজের শক্তিতে জল্ জল্ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ছে।—ব'লে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। আমার পরিশ্রান্ত শরীরটা তাঁর বিছানার উপর সটান্ ছড়িয়ে দিলাম। বাইরে বর্ষার ধারা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে ঝরুছে। মাঝে মাঝে

আকাশ ডেকে উঠ্‌ছে আজকে বৃষ্টি ধরবার আর কোনো চিহ্ন নেই।

এমন সময় ভগবতী এসে দাঁড়াল। বোঝা গেল, রবিঠাকুরের গান তাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করেনি। হাতে তার ফল ও মিষ্টান্নের একখানা রেকাব। হেসে বললে, কখন চুপি চুপি এলেন সোমনাথদা ?

এই একটু আগে। এসে মাকে পেয়েই খুসি হয়ে গেলুম। তোমাদের ঘরে গিয়ে গল্পের ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছে হোলো না।

তার মুখে চোখে খুসির রক্তাভা খেলছে। আনন্দের চেহারাটা মেয়েদের বিচিত্র। তারা প্রচার করে না, প্রকাশ করে। ভগবতী যেন স্বপ্নলোক থেকে উঠে এসে দাঁড়াল। গ্রামে যখন সে ছিল তখনো এই প্রাচুর্য্য, এই ঐশ্বর্য্য,—ইদানীং কেবল তার রঙের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রভাতের মেঘ যেন সূর্য্যকিরণের ছোঁয়ায় গোলাপের রঙে রাঙিয়েছে আপন সর্ব্বাঙ্গ। মা একটু হেসে বললেন, —আমার জন্মে এখন থাক, ওটা দে মা সোমনাথকে।

আমার দৃষ্টিতে সে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি টিপাইটা কাছে টেনে রেকাবখানা রেখে বললে, দাঁড়ান্‌, জল এনে দিই।

মা বললেন, বঙ্কিমকে দিয়েছিস্‌ মা ?

এইবার দেবো।—ব'লে লজ্জিত মুখখানি ফিরিয়ে ভগবতী দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে মা হাসতে হাসতে বললেন, ভগবানের কাণ্ড!

ওঘরে গিয়ে মিনুর চাপা গলার আওয়াজটাই আবার শুনলাম,— আঃ চুপ করো বলছি, চেঁচিয়োনা। সোমনাথদা কী ভাববেন!

তুমি বড় অস্থির, বঙ্কিম। ওকি, বসো চুপটি করে। ভারি দুরন্ত তুমি।

বঙ্কিম তার নিষেধ-বাক্যে আরও উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ল। উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল :

'কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।'

মিনুর দ্রুত বিপর্য্যস্ত গলার আওয়াজ আবার শোনা গেল,—আঃ কাজ আছে বলছি, সরো।

মা এ-ঘর থেকে ডাকলেন, বঙ্কিম?

বঙ্কিম তাড়াতাড়ি ছুটে এ-ঘরে এসে দাঁড়াল। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল। বললে, কি মা?

পাগলামি হচ্ছিল বুঝি এতক্ষণ?

কী আবিষ্কার তোমার! পাগলের পাগলামি খুঁজে বা'র করেছ! জগদীশের কি খবর রে?—বঙ্কিম বললে।

হেসে বললাম, বৌদির বাড়ীতে ঘন ঘন নেমন্তন্ন খাচ্ছে।

বঙ্কিম চুপ ক'রে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, তাই নাকি? হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকো সামলাতে পারবে ত?

মা বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলা ওরা ক'জনে এসেছিল আমার কাছে। লোকনাথ, জগদীশ, শম্ভু আর প্রভাত। বড় দুরবস্থা হয়েছে লোকনাথের। চাকুরি পেয়ে স্ত্রীকে আন্‌ল এখানে, বাড়ীভাড়া, সংসার খরচ, কিন্তু মাইনে পায়না আজ তিনমাস। তোমাদের দেশি খবরের কাগজের আফিসে কোনো শৃঙ্খলা নেই।

বঙ্কিম বললে, বিশেষত ওই ‘স্বাধীনতা’ কাগজখানার। বেকার দুর্ভাগ্যদের ধ'রে ব্যাগার খাটিয়ে নেওয়াই ওদের কাজ। কাগজ খানার ভেতরে এত দলাদলি, এত স্বার্থপরতা যে, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে মা।

মা বললেন, শুনেছি আমি কিছু কিছু লোকনাথের মুখে। নষ্ট ক'রে দেয়না কেন? নিজেদের ভণ্ডামি লুকিয়ে স্বার্থের লোভে যারা কাগজে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তোমরা তাদের ক্ষমা করো কেন? কালকে লোকনাথের মুখে কতকগুলো খবর পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম, সোমনাথ। এ তোমরা সহ্য করো?

মায়ের এই চেহারাটা আমাদের পরিচিত সুতরাং আমরা চুপ ক'রে রইলাম। সহ্য আমাদের অনেক করতে হয়, তার সব ইতিহাসটা মা'র জানা নেই। তাকে জানানোও চলে না।

মা বলতে লাগলেন, অত বড় ছেলে, কথা বলতে বলতে কাল তার চোখে জল এল। পাঁচ বছর তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু অভাবের জ্বালায় পাঁচদিনও সে স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে পারেনি। আজ যদি বা রাখবার একটু উপায় হোলো, যদি বা চাকৃরি একটা জুটল, কিন্তু যে কে সেই!—বলতে বলতে মা যেন নিজের আগুনে নিজেই জ্ব'লে উঠলেন, কেন তোমরা উমেদারি করো তিন পয়সার চাকৃরির পেছনে? তোমরা অকর্ম্মণ্য, তোমরা মনুষ্যত্বহীন। মরতে পারো না মাথা ঠুকে? পালাতে পারো না রাজ্য ছেড়ে? অপমান সয়ে সয়ে যক্ষ্মা ধরল যে মেরুদণ্ডে! কান্না, কান্না, মলুম কান্না শুনে শুনে! ভাতের জন্যে কান্না, কাপড়ের জন্যে কান্না, চাকৃরীর জন্যে কান্না। মারতে পারিসনে চাবুক ঐই ভিখিরীর জাতটার পিঠে? পারিসনে পৃথিবীর বুক থেকে এই কাঙালের বংশটাকে মুছে দিতে?

বঙ্কিম বললে, কিন্তু এর মধ্যে অনেক কথা আছে মা। আমরা যে পরাধীন, আমরা যে—

উত্তপ্ত কণ্ঠে মা বললেন, থাক, আর বলিসনে বাবা, শুনতে আর পারিনে। এই কথাটা দিনকতক আর উচ্চারণ করিসনে, কান গেল ঝালাপালা হয়ে। ষষ্ঠি-শেতলার দোর ধরা জাত, মাদুলি-ঘুনসি পরার বংশ, ঘরের মানুষ ঘরে ঢুকলে চণ্ডাল ব'লে তাকে ঝেঁটিয়ে তাড়াস,—পরাধীন থাক্ তোরা জন্ম জন্ম।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর কটূক্তিগুলি বসে বসে হজম কচ্ছিলাম এমন সময় ফল ও মিষ্টান্নের আর একখানা রেকাব নিয়ে ভগবতী ঘরে ঢুকল। এক হাতে জলের পাত্র। বঙ্কিম বললে, এমন অসময়ে আমি খাইনে কিন্তু।

আপনার সময় কখন্ আমি ত জানিনে। শিগগির খান্ নৈলে মা রাগ করবেন।

আড়ালে 'তুমি' এবং সুমুখে 'আপনি'—বঙ্কিম আর ভগবতীর এই সম্পর্কটায় বেশ কৌতুক বোধ করলাম। বঙ্কিম হেসে তার মুখের দিকে তাকাল। বললে, দেখুন, আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার আছে। বলেই ফেলি, কেমন ?

আমার অলক্ষ্যে ভগবতী তাকে চোখ দিয়ে কি ইঙ্গিত করবার চেষ্টা করল কিন্তু এত সামনাসামনি লুকোচুরি করতে তার বাধল। নিরুপায় সাহসের সঙ্গে বললে, এমন আর কি কথা, বলুন না ?

হ্যাঁ, বলেই ফেলি। সোমনাথ আমার বিশেষ বন্ধু, ওর সামনে বললে কোনোই ক্ষতি নেই।

ভগবতী তার বেফাঁস কথার আভাস পেয়ে অত্যন্ত জড়োসড়ো

হয়ে গেল। থতিয়ে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল কিন্তু মুখ ফুটল না। মুখখানা দেখতে দেখতে রাঙা হয়ে উঠল। কেবলমাত্র লজ্জাই নয়, আশঙ্কায় সে যেন কাঁপছে। চোখে তার অতি ভীরু ভাষা!

বঙ্কিম বললে, বলছি যে এসব খাবার খেতে এখন আমার রুচি নেই।

আমি হেসে উঠলাম এবং তখনই দেখতে দেখতে ভয় কেটে গিয়ে ভগবতীর মুখে হাসি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

আপনার কেবল তামাসা, আমি ব'লে দিচ্ছি মাকে। বলতে বলতে সে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হেসে বললাম, তোমার ধরণ দেখে বেচারা ভারি মুস্কিলে পড়েছিল।

বঙ্কিম বললে, মেয়েদের বিপদ এইখানে। দরকারি কথা আছে বললে ভালোবাসার কথা ছাড়া তারা আর কিছু কল্পনা করতে পারে না।

এবার বললাম, কেমন মনে হচ্ছে ভগবতীকে?

অপূর্ব্ব! In every sense of the word.

হেসে বললাম, এটা ত তোমার স্বভাব। কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলেই তাকে তুমি দেবী বানিয়ে তোলো। তোষামোদটা প্রশংসা নয়।

বঙ্কিম বললে, তুমি চেনো না ভগবতীকে তাই এ কথা বলছ। মেয়েকে জানা যায় ভালোবাসলে।

তুমি ভালোবেসেছ ওকে?

Infinitely! জীবনে প্রথম ভালোবাসলাম! The last word of love.

বিয়ে করতে পারো ?

মা এসে ঘরে ঢুকলেন। কথাটা চাপা পড়ে গেল। বঙ্কিম দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে বসল,—একটু অন্যমনস্ক, একটু চিন্তিত।

মা বললেন, লক্ষ্মণের ফল ধ'রে দুজনেই যে বসে আছ ? কুটুম্বিতে না করলে বুঝি খাওয়া হবে না ?

বঙ্কিম সজাগ হয়ে বললে, তুমি প্রসাদ ক'রে দাও। মা দিলে কিছুতেই খাবো না।

তোমরা যা ধরবে তাই করবে,—কেমন ? ব'লে মা দুজনের রেকাব থেকেই দুখানা আনারসের টুক্‌রো তুলে নিলেন। বঙ্কিম রাগ ক'রে বললে, সোমনাথকে তুমি বেশি ভালোবাসো মা, তাই ওর আনারস আগে নিলে !

বটে !—মা বললেন, আর কালকে আমার পাতে বসে খেয়েছিল কে ? কোথায় ছিল সোমনাথ ? হিংসুটে ছেলে কোথাকার।—ব'লে তিনি কাপড়চোপড় নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন।

আমরা সবাই হাস্‌তে লাগলাম। এমন সময় ভগবতী আবার ঘরে এসে ঢুকল। বললাম, বসো মিনু। আচ্ছা, তুমি ত ভালো গান গাইতে পারতে। এমন বর্ষায় একটা গাইলে মন্দ কি।

আমাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা কুণ্ঠা রয়েছে, একটা সম্মান ও স্নেহের সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে রয়ে গেছে,—আমরা দু'জনেই সেটা উত্তীর্ণ হতে পারিনে, সহজ বন্ধুত্বের বাতাস বয় না, সঙ্কোচ একটুখানি থেকেই যায়। কারণটা বুঝি। এবং কারণটা যে কেবল আমি তার পরিবারের গোপন ইতিহাসটা জানি, তাই নয়, একই গ্রামের পটভূমিকায় আমরা মানুষ, গ্রাম সম্পর্কে সে আমার ভগ্নী—আমাদের পল্লীসভ্যতা ও শিক্ষায় আমরা পরস্পর ভাইবোন বলেই বেড়ে উঠেছি।

শহরের আওতায় এসেও সেটা ঠিক কেতা-দুরস্ত আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি।

ভগবতী চেয়ারখানাতেই বসতে পারত কিন্তু আমার পাশে এসে বসল, বললে, থাকগে গান সোমনাথদা। আর একদিন আপনাকে শুনিয়ে দেবো।

হেসে বললাম আচ্ছা থাক্ থাক্।

বঙ্কিম জনান্তিকে বললে, লোকের অনুরোধ পালন করা উচিত।

মিনু চটে উঠ্‌ল। বললে, সে আমি বুঝবো সোমনাথদার সঙ্গে। এত যদি সখ আপনিই একটা গান্ না?

বোঝা গেল এদের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম থেকেই লক্ষ্য ক'রে এসেছি। মুখ রাঙা করা, ছোট হাসি চোখের ভাষা, কাছে এলে আলোকিত হয়ে ওঠা, অসমাপ্ত উক্তি রেখে চলে যাওয়া। তারপর মান অভিমান, পরস্পরের দাবি আর শাসন, বোঝাপড়া বিবাদ আর আপোষ-নিষ্পত্তি, এই ত উপন্যাস, এই ত গল্প! এর নাম প্রেম, এত সহজ, এত প্রাঞ্জল। এই নিয়ে নানা খেলা, নানা অভিনয়, এই নিয়ে নানা গোলযোগ। এই প্রেম জনসাধারণের। এই পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া, সুলভ, বহুচর্ব্বিত, দুর্ব্বল চিত্তোচ্ছ্বাস, এরই বিভিন্ন অনুকৃতি চলে মানুষের সমাজে, একেই নানা অসংলগ্ন কথার রাংতায় মুড়ে লোকপ্রিয় কথাশিল্পীরা সহিত্যে চালায়, টাকা কুড়োয়। মনে মনে কৌতুক বোধ করলাম বটে কিন্তু কোথায় যেন একটি গভীর অবসাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে এল।

মা এসে আবার দাঁড়ালেন। বৃষ্টি তখন একটু থেমেছে। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। তিনি বললেন, পড়াতে যাচ্ছি, তোমরা একটু বোসো বঙ্কিম। সোমনাথ, তোমাকে একটা কথা বলি।

আমি উঠে তাঁর সঙ্গে বাইরে গেলাম। বারান্দা পার হয়ে গেলাম তাঁর শোবার ঘরে। মা বললেন, মিন্নুর সামনে বললুম না, হয়ত লজ্জা পাবে। তোমার বাবার খবর কি, কোথায় তিনি?

বললাম, গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে সেদিন দেখা হোলো। সে বললে, বাবা এখানেই আছেন, কল্‌কাতার বাড়ীতে।

আমি না হয় একদিন যাবো তাঁর ওখানে।

কেন মা?

কেন? গিয়ে বল্‌ব, যার ওপর এত রাগ, সে ছেলে আপনার নির্দ্দোষ! অন্যায় সে কোনোদিন করে নি!—এই বলব?

অন্যায় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তোমার সঙ্গে মিলবে কি? একটি মেয়েকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, এই ঘটনাটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তোমার গিয়ে কাজ নেই।

মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করলেন তারপর বললেন, কিন্তু এমন ক'রে তোর ক-দিন চল্‌বে বাবা?

হেসে বললাম, প্রতিদিনই ত চলছে মা।

একে চলা বলিস? অন্ন নেই, আশ্রয় নেই, আশা নেই! অমন বাপের সাহায্য নিতে আমি বলতুম না, কিন্তু নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মতো শিক্ষা যে তোদের হয়নি, যোগ্যতা নেই যে তোদের! এটা মেয়েদের বোর্ডিং, এখানে যে কোনরকমেই তোকে রাখতে পারিনে বাবা।—তাঁর গলা অশ্রুতে ভিজে উঠ্‌ল।

বললাম, তোমার কাছে থাক্‌ব এ তুমি কল্পনাও ক'রো না। তুমি যদি ব্যস্ত হও মা, তাহলে আমাকে এখানে আসা বন্ধ করতে হয়।

ব্যস্ত হই কি সাধে বাবা, হই প্রাণের দায়ে। আজ এসেছিস ভালো হয়েছে, গোটাকতক টাকা দিই, সঙ্গে রাখ্‌।

টাকা? টাকা কি হবে মা?

ওমা, তুই কি পাগল রে, টাকার দরকার নেই?

না, একটুও না। টাকা ছাড়া আর সব দরকার, টাকার দরকার আমার নেই।

আমার কণ্ঠে বোধকরি কিছু সঞ্চিত অভিমান প্রকাশ পেয়েছিল, কণ্ঠস্বর শুনে মা আর কথা বললেন না, কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখলাম, মাতৃহৃদয়ের সমস্ত দাক্ষিণ্যে তাঁহার চোখ ও মুখ প্লাবিত হয়ে গেছে। আমি কী বলব, আমার তৃষিত ব্যাকুল মন কী যে চায় জানিনে, মাতৃহীনের গভীর অনুভূতি আমার নেই, তার জন্ম আমি লজ্জিত। হয়ত আমার মাও ছিলেন এমনি, এমনি চোখ, এমনি মুখ, এমনি রূপ, হয়ত তাঁরও অন্তর ছিল এমনি অশ্রান্ত উদ্বেগ, অশান্ত স্নেহ।

কিন্তু সত্যের চেহারা এ নয়। মাতৃস্নেহের মধ্যে সত্য নেই, আছে মায়া, আছে পথ-হারানো ভ্রান্তি, আছে বন্দীত্ব। মানুষের পথ দুর্গম, মানুষের পথ ছায়ালেশহীন। তবু হঠাৎ মনে হোলো আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যারা নিকটে আসতে চায় তাদের দূরে সরিয়ে দিই, যারা কাছে টানে তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে পারলে বাঁচি। আঘাত করা আমার ধর্ম্ম, ব্যথা দেওয়া আমার রীতি। আমার চরিত্রের ভিতরে প্রাণের ছোঁয়াচ কোথাও কিছু নেই, স্নেহ নেই, দাক্ষিণ্য নেই, মোহ নেই,—নির্দ্দয়ভাবে নির্লিপ্ত আমার মন,—বিশ্বনিয়ন্তার মতো নির্লিপ্ত। আমার চোখের দৃষ্টি শানিত তরবারির মতো উজ্জ্বল, নির্ম্মম। আমারই বুকের ভিতর দিয়ে যে-পথ, সে-পথ মরুভূমির,—সেই মরুভূমির প্রান্ত-দেশে আশার সমুদ্র, অত্যন্ত কামনার তরঙ্গ ভঙ্গ, জীবনের অনন্ত চঞ্চলতা। সেই পথ দিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে আমার অবিশ্রান্ত গতি। মাতৃস্নেহের আতিশয্যে চলৎশক্তিহীন হতে পারে না আমার মন।

মা মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিলেন, হাতটা ধরলাম।

মা? রাগ করলেন?

তিনি আমার মাথাটা কাছে টেনে নিলেন। মৃদু অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, কেবল আমিই তোর ওপর কোনদিন রাগ করব না বাবা। আমি ত জানি কোথায় তোর মনে ভাঙন ধরেছে। এবার আমি যাই। বঙ্কিম, আয় বাবা, এবার এগোই।

আকাশ কিছু পরিষ্কার হয়েছিল, বৃষ্টি থেমেছে। আজকের সন্ধ্যা অতি সুখকর, মাকে আজ অত্যন্ত ভালো লেগেছে, তাঁর কাছে, কেমন ক'রে যেন নূতন জীবনের উদ্দীপনা পেয়ে গেছি। ডাক শুনে তখনই বঙ্কিম আর মিনু বাইরে বেরিয়ে এল। মা অলক্ষে তাদের দিকে চেয়ে একটু স্নিগ্ধ স্নেহের হাসি হাসলেন। সেই হাসি দেখে মিনু তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। আমরা কোলাহল করতে করতে সেদিনকার মতো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। হৃদয়ের সুরে সমস্তটা ভরে গেছে, আজকের দিনটি অপূর্ব্ব লাগছে।

কিছুদিন কাট্‌ল। বর্ষাটা পুরাতন হয়ে এসেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন না দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, ক্লান্ত হয়েছে মন।

লোকনাথকে তার বাসাটা ছাড়তে হোলো। না দিতে পারল ঘরের ভাড়া, না চালাতে পারল সংসার-খরচ। সস্ত্রীক এসে উঠ্‌ল মাসীর কাছে। যদিচ ঘরভাড়া লাগবেনা কিন্তু এদিকে মাসির অবস্থাও তথৈবচ, মাসিক কিছু টাকা না দিলে মাসির চলবে না। আর, বিয়ে করলে যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ জোগাতে হয়, এ কথা পাঁচ-বছরের ছেলেটিও জানে।

মাসির ওখানে আমাদের যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু খবর আমাদের কানে ঠিকই আসে। প্রভাত আর শম্ভু আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা।

মাঝে শোনা গেল, লোকনাথ প্রায়ই লটারির টিকিট কিনছে, তারপর শুনলাম জুয়াড়ীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যায়। একদিন 'স্বাধীনতা' আপিসে গিয়ে তার দেখা পাওয়া গেল না, সে নাকি ইচ্ছামতো আসে আবার ইচ্ছামতো চলে যায়। আপিসে তার চার মাসের মাইনে বাকি। একদিন কর্ত্তারা নাকি পাঁচটি টাকা লোকনাথকে দিয়েছিল, লোকনাথ তার থেকে দুটাকা তার একজন প্রিয় কম্পোজিটারকে দিয়ে বাকি তিনটাকা এমন এক পল্লীতে গিয়ে খরচ করে এসেছে, যাতে জানা যায় তার স্বভাব-চরিত্র খারাপ। স্বভাব-চরিত্র বাঁচিয়ে চলা আমাদের কাজ নয়, ওদিকটায় মনোযোগ দেবার মতো যথেষ্ট সময়ও আমাদের নেই, নানাদিকেই আমাদের উদ্বেগ, সুতরাং কা'র চরিত্রে কতটুকু প্রলোভনের আঁচ লেগেছে, চরিত্রের পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হোলো, কে হোলো না—সেদিকে আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। মানুষের স্বভাব নিজের পথ ধ'রে চলে, এ আমরা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি। যেমন আমাদের বঙ্কিম ; বঙ্কিম মদ্যপান করে, বঙ্কিম ধর্ম্ম মানে না, বঙ্কিমের দুরন্ত দুঃসাহসের গল্প আমরা সবাই জানি, অথচ দেখতে পাই কোথায় যেন তার একটি কোমল স্নেহশীল মন বন্ধুদের জন্য কাঁদে, কখন্ গোপনে সে নিঃশব্দে ছুটে যায় পরের দুঃখ মোচন করতে। তার সুললিত কণ্ঠের গান শুনে কত বর্ষার রাত, কত বসন্তের জ্যোৎস্না আমরা উপভোগ করেছি, অচেতনভাবে অতিবাহিত করেছি। কাব্য-সাহিত্য ও ললিতকলা সম্বন্ধে তার গভীর উপলব্ধির আনন্দদায়ক আলোচনা শুনে কতদিন আমরা মুগ্ধ হয়েছি। সেই বঙ্কিম—সেই বঙ্কিমকে অসচ্চরিত্র ব'লে দূরে সরিয়ে রাখা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না।

সেবাশ্রমে এসে উঠলাম। মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে, ন'টা কি

দশটা বাজে। পাশেই শিবের মন্দিরে জীবনকৃষ্ণ পূজায় বসেছেন। ঘরে ঢুকেই পাওয়া গেল জগদীশকে। বেরোবার উপক্রম করছিল. আমাকে দেখেই সে চ'টে গেল। আপাদমস্তক তাকিয়ে বললে, ঠ্যাঙানো জন্তুর মতো গুটি গুটি আসা হচ্ছে, কোথায় ছিলে দুদিন? খুঁজে খুঁজে সবাই হায়রান!

তিরস্কার করল কিন্তু তার কণ্ঠে প্রকাশ পেল বন্ধুপ্রীতি। বললে. হতভাগা, মাকে পর্য্যন্ত বয়কট্ করেছিস্? কোথায় ছিলি?

হেসে বললাম, গতদিনের ইতিহাস জানতে চেয়ো না জগদীশ কিন্তু তুমি এত তোড়জোড় করে কোথায় চলেছ বলো ত?

আমি? আমি কি তোদের মত হরিজন? আজকাল অভিজাত সমাজে মিশি, তা জানিস? মোটরে চ'ড়ে বেড়াই!

কলিকাতায় একটিমাত্র অভিজাতকে আমি চিনি, সে আমাদের সুবিখ্যাত কবি বাণীপদ বাঁড়ুয্যে। তাই বললাম, আমাদের সাহিত্যিকের ওখানে বুঝি?

জগদীশ বললে, তার চেয়েও হাল-আমলের অভিজাত,— আমাদের বৌদিদি রে! রাঙাপেড়ে খদ্দর-শাড়ী-পরা স্বাধীন জেনানা পালিশ করা চুল, পালিশ করা মুখ। গহনা-গাঁটি খুলে ফেলেছেন নব্যরুচির আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে। তরুণ বয়সের ছোকরারা তাঁর রাঙা পা দুখানির ভক্ত!—এই ব'লে সে মাদুরের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

তোমার ভক্তিই বা কম কিসে জগদীশ?

মোটেই কম নয়। সেদিন ভক্তির কিছু আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছিল ব'লে 'ভাই' পাতিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে। দাঁড়া, এ গোঁজামিলে ভয় পাসনে সোমনাথ। বোর্ডিংয়ের ছাত্রীদের মধ্যে এ

'কাজিন-ভাই' পাতানোর বুজরুকি বোধহয় নয়, কিছু সত্য হয়ত আছে।

কিন্তু তিনি অভিজাত হলেন কেমন ক'রে?—বললাম।

বলিস কি, অভিজাত নয়? সাপ্তাহিকে বৌদিদির ছবি ছাপা হয়, দৈনিক বাংলা কাগজে তাঁর বিবৃতি বেরোয়, আমার মতো তরুণ কনগ্রেস নেতারা প্রাইভেট্‌লি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন,—অভিজাত কি আর গাছে ফলে রে?

তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সে পুনরায় বললে, বোস্‌, আমার পাতানো বোনের ওপর অবিচার করিসনে। স্বাধীন-জেনানা ব'লে তোরা বিদ্রূপ করিস, কিন্তু চিনিসনে প্রিয়ম্বদাকে। পুরাণো কালের কাত্যায়নী-হরিলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর একটুও তফাৎ নেই। ওরে, মেয়েরা কোনোকালেই আধুনিক নয়, চিরকাল তারা একই কারণে পুরুষের পেছনে-পেছনে প্রাণের টানে ছুটোছুটি করছে। কেবলই দেবার জন্য তাদের আকুলি বিকুলি, আত্মসমর্পণ করবার জন্য নিত্যকাল থেকে তারা আমাদের দুখানা কঠিন কর্কশ পা খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেচারিদের বিদ্রূপ করিসনে সোমনাথ।

এ কথা শোনবার পর বৌদিদি কিন্তু তোমার সম্বন্ধে—

শুনেছেন তিনি, শোনাতে পেরেই ত সহজ হয়েছি। তাঁর কাছে। প্রাণের ঐশ্বর্য্য রাখবার জন্য তাঁর পাত্র একটা চাই, ঘরের মানুষটি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাধ্যতামুলক ব্যবস্থায় মেয়েদের চিত্ত উৎপীড়িত হয়ে ওঠে, তারা-যে প্রকৃতির রূপ,—তাই ঘরের পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে বৌদিদি ছুটলেন দেশমাতৃকার পরাধীনতা ঘোচাতে, পুরুষের পথ নিলেন বেছে,—একেই বলে আত্মদ্রোহিতা, আপন স্বভাবের বিপরীত কাজ করা। —জগদীশ হেসে হেসে ব'লে যেতে লাগল,—বিধি

নিয়ম দেখলেই মেয়েরা ভয় পায়, অশান্ত হয়ে ওঠে তাদের মন,—আমাদের বৌদিদিও তাই। স্বামীকে সর্ব্বান্তঃকরণে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি অতএব দেশের কাজে তাঁকে নামতে হবে, বেচারা দেশ! বিধবা মেয়ে বাপের বাড়ীতে লাঞ্ছিত হচ্ছে অতএব নাম্‌ল পোলিটিক্যাল্‌-সংগ্রামে; কুমারী মেয়ের পাত্র জুটছে না, অতএব চেঁচিয়ে উঠ্‌ল 'বন্দে মাতরম্‌' ব'লে; কেরাণির বউ স্বামীর হাতে মার খেল সুতরাং লুকিয়ে মনুমেণ্টের তলায় গিয়ে তার 'স্বাধীনতা-দিবস' পালন করা চাই! মেয়েদের সমাজ-বিদ্রোহটা দেশপ্রীতির নামে বেশ চলে যাচ্ছে, সোমনাথ।

হেসে বললাম, তার জন্যে তোমার গাত্রদাহ কেন জগদীশ?

ফিরে আসি, এসে বলব। বুঝ্‌লি সোমনাথ, এটা গাত্রদাহ নয়। মেয়েরা বেড়ে উঠছে সে জন্যে আমি খুসি, কিন্তু তারা গোঁজামিল দিয়ে যখনই কাজ সারতে চায় তখনই হেসে উঠি। চলি, আর সময় নেই, বৌদি হয়ত পথ চেয়ে আছেন!—এই ব'লে সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টুকরো হাসির শব্দ শুনলাম।

এক মিনিট পরেই দেখি, সে আবার হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকছে, পিছনে শম্ভু। রুক্ষ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে শম্ভু পাগলের মতো এসে বললে, শিগগির এসো সোমনাথদা।

দুজনের দিকে তাকিয়ে বললাম, কেন? কি?

জগদীশ বললে, আয়, লোকনাথকে নাকি পুলিশে ধরেছে।

তৎক্ষণাৎ উঠে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। বললাম, পুলিশে? কেন?—ভয়ে আমার গলা বন্ধ হয়ে এল।

তারা দুজনেই তখন ছুটছে। আমি ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে শম্ভু

বললে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারা যায়নি। হাতকড়া দিয়ে তাকে থানায় নিয়ে গেছে।

বিশ্বসংসার যেন চোখের সুমুখে ঘূর্ণীর মতো ঘুরতে লাগল। এমন কী অপরাধ করেছে লোকনাথ যে পুলিশে ধরবে? যদি আর না ছাড়ে? জগদীশ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এক সময় বললে, কোনো রাজনৈতিক কারণ নাকি? বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করেছিল?

না, সে সব কিছু নয়।—ব'লে শম্ভু ছুটতে লাগল।

তবে? পরস্ত্রীহরণ করেছে?

তাও না।

শম্ভুর কাছে টাকা ছিল, বড় রাস্তা থেকে একখানা ট্যাক্সিতে ওঠা গেল। দৌড়, দৌড়, দৌড়। তীরবেগে ছুটল মোটর। ভাড়া বাদে ড্রাইভারকে কিছু বকশিস কবুল করা গেল। আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে গেছি, নির্ব্বাক হয়ে আছি।

জগদীশ একসময় বললে, তবে কী? কাগজে সিডিশন্ ছাপিয়েছে?

শম্ভু বললে, তার নাম ত আর সম্পাদক ব'লে ছাপা হয় না, তাকে ধরবে কেন?

কেমন ক'রে আমাদের পথটা ফুরাতে লাগল মনে নেই। আমাদের বেপরোয়া ট্যাক্সি যে-কোনো অসতর্ক পথিকের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল না এইটেই আশ্চর্য্য। জনষ্টলায় রাজপথ তখন মুখরিত, আপিস-ইস্কুল খোলা,—চারিদিকে পিপিলিকার মতো মানুষ, পিপিলিকার মতো গাড়ী-ঘোড়া,—দ্রুত, অন্ধ, উন্মত্ত। কেউ যদি চাপা যায় আমরা দুঃখিত হবো না, সকলের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে লোকনাথের কাছে যদি পৌছতে পারি তার জন্যও আমরা প্রস্তুত। পুলিশ ত সামান্য, মৃত্যু পর্য্যন্ত গিয়েও লোকনাথকে ধরতে হবে। সে বড় মূল্যবান,

সে বন্ধু। বন্ধুর সংখ্যা জগতে অতি অল্প, একজনেরো অভাব আমাদের সইবে না।

থানার কাছে এসে গাড়ী থামল। জগদীশ লাফিয়ে পড়ল ফুট-পাথের ওপর। লোহার গেট্‌এর বাইরে অনেক লোকজন জমায়েৎ হয়েছে, তাদের চোখে মুখে কৌতুহল, নানা বক্রোক্তি, নানা আলোচনা,—কোনোটাই বোধগম্য নয়। জগদীশের পিছনে পিছনে ভিড় ঠেলে দরজায় উঠতেই একটা পাহারাওয়ালা বাধা দিল। জগদীশ বললে, ছাড়ো, আমরা আসামীর ভাই।

সে ছাড়ল না কিন্তু ভিতর থেকে দারোগা বেরিয়ে এলেন।

আরে, জগদীশবাবু যে? আপনি? কি মনে ক'রে?

জগদীশ নমস্কার জানিয়ে হেসে বললে, আপনাদের দ্বারস্থ না হ'লে আমাদের আর গতি কি! আপনাদেরই ত রাজত্ব!

দারোগা হেসে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন। হঠাৎ আজ অসময়ে পায়ের ধূলো দিলেন যে?

জগদীশ বললে, ল্যাজে পা পড়েছে ভুপতিবাবু। পায়ের ধূলো না দিয়ে উপায় কি? এমনো হতে পারে ধূলো কিছু নিয়ে যেতেও এসেছি!

কপালে হাত ঠেকিয়ে দারোগা বললেন, দুর্গা, দুর্গা, বলেন কি আমরা আপনাদের পায়ের খড়ম। আপনি এত বড় একজন পেট্রিয়ট, কলেজস্কোয়ারে আপনার সেই বক্তৃতাটা আমি আজো মুখস্থ বলতে পারি। কি করব বলুন, পেটের দায়ে চাকরি করি, তাই আপনাদের য়্যারেষ্ট্ করতে হয়! তারপর, কি খবর বলুন?

শম্ভু ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জগদীশ ভূমিকা না করেই বললে, লজ্জার মাথা খেয়েছি ভূপতিবাবু, এসেছি

আমাদের এক বন্ধুর খবর নিতে। তিনি আপনাদের এই মন্দিরেই আছেন।

কে বলুন ত?

তাঁর নাম লোকনাথ লাহিড়ী।

তৎক্ষণাৎ ভূপতিবাবুর চেহারা গেল বদ্‌লে। তাঁর মুখভঙ্গীর এমন বিস্ময়কর দ্রুত পরিবর্ত্তনে আমাদের মুখ পর্য্যন্ত লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বোঝা গেল, তিনি পুলিশের দারোগা ছাড়া আর কিছু নন্! বললে, দয়া ক'রে এখনই চ'লে যান আপনারা, নৈলে এই নোংরা কেসে আপনারাও জড়িয়ে পড়বেন,—এই ব'লে তিনি চ'লে যাবার উপক্রম করলেন।

জগদীশ তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, আমাদের জড়ানো আপনারই হাত ভূপতিবাবু। আমরা কেবল জানতে এসেছি তার অপরাধটা কি।

এগারোটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হবে, তখনই জানতে পারবেন আপনাদের বন্ধুর গৌরব-গাথা!

তাঁর বক্র ওষ্ঠের বিদ্রূপে রক্তের মধ্যে কোথায় যেন আগুন ধ'রে গেল, হঠাৎ কী যে একটা প্রলয়ঙ্কর ইচ্ছা জেগে উঠ্‌ল বলতে পারিনে। কিন্তু নিঃশব্দে নিজেকে সংযত ক'রে বললাম, দয়া ক'রে বলুন না?

দয়া ক'রে তিনি শেষ পর্য্যন্ত যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই: অল্প কিছু অর্থ ছিল লোকনাথের কাছে কাল সন্ধ্যার পর সে গিয়েছিল পল্লীবিশেষে একটি স্ত্রীলোকের ঘরে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটিকে সে মদ্যপান করায়, ফলে স্ত্রীলোকটি প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় লোকনাথ তার গলার হার খুলে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। সদর দরজায় এসে দেখে ভিতর থেকে তালা বন্ধ। ইতিমধ্যে তার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে আর একটি স্ত্রীলোক গোলমাল ক'রে ওঠে।

সে ধরা পড়ে। ভোর বেলা কয়েকটি বেশ্যা মিলে তাকে থানায় দেয়। সিরিয়স কেস্।

জগদীশ হেসে বললে, এই মাত্র? ঘটনাটা এতই সাধারণ যে, চমক লাগে না। বুঝলি শম্ভু, লোকনাথটার অরিজিনালিটি নেই!

শম্ভুর চোখের জল গালের উপরে নেমে এসেছে, সে উত্তর দিল না। ভূপতিবাবু বললেন, আসামীর তরফ থেকে ডিফেণ্ড্ করা হবে কি?

জগদীশ বললে, হওয়াই ত উচিত। কিন্তু ভূপতিবাবু, একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। আমাদের বন্ধু, আমাদের সঙ্গী, আমরা সবাই দরিদ্র, আপনি না দেখলে উপায় নেই!

আমি কি করতে পারি জগদীশবাবু? চুরি করেছে, ফল ভোগ করবে!

এবার বললাম, কোর্টে কেস্ উঠলেই ওর কন্‌ফিকশ্যন্ হবে, তার আগে আপনি মিটিয়ে না দিলে আর উপায় নেই। আমাদের মিনতি, আমাদের প্রার্থনা—

ভূপতি বললেন, আমি মেটাবো? অসম্ভব! সেই বেশ্যাটা এসে ব'সে রয়েছে ভেতরে, সে ছাড়বে কেন? তা ছাড়া ডেপুটি কমিশনারের কাছে কেস্ লেখা হয়ে গেছে!

কিন্তু সব আইনেরই ব্যতিক্রম আছে ভূপতিবাবু। এই ব'লে জগদীশ এক পা এগিয়ে দারোগার হাত ধরল। আমাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান ইতিমধ্যেই কিছু কমে গেছে, আমরাও হাত জোড় ক'রে বললাম, সেই মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা করতে দেবেন?

তা দেবো না কেন, আসুন।

আমরা তিনজনে তাঁর অনুসরণ করলাম। সমস্ত থানাটার ভয়ানক আবহাওয়াটা যেন আমাদের টুঁটি টিপে ধরতে চাইছে।

বারান্দাটা পার হয়েই দুটি স্ত্রীলোককে আমরা দেখতে পেলাম। লক্ষ স্ত্রীলোকের ভিড়ে থাকলেও বারবনিতাকে চিনতে দেরি হয় না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দারোগা তাদের ভিতরে একজনকে ডেকে বললেন, ওগো কাননবালা, এঁরা আসামীর লোক, এঁদের সঙ্গে একটু ভাব করবে?

একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল, প্রথমটা আমাদের দিকে ফিরে তাকাল না, দারোগার দিকে তাকিয়েই হেসে বললে, আপনার কেমন ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা, আমি কি বলছি যে ভাব করব না?

জগদীশ ফস ক'রে বললে, লোকনাথটার প্রবৃত্তি খারাপ কিন্তু রুচিটা ভালো!—তারপর সে নিজেই এগিয়ে কাননবালার সঙ্গে আলাপ করলে, হেসে বললে, আহা মা যেন আমার অন্নপূর্ণা, এসো ত মা একটি কথা বলি?

কথা বলুন, আমি আপিস ঘরে আছি। ব'লে দারোগা সেখান থেকে চলে গেলেন। মুখে তাঁর অল্প চাপা হাসি,অর্থাৎ জগদীশের 'মা' বলার তোষামোদটা তাঁর কানেও একটু বাজ্‌ল।

আমার চোখ ছিল থানার হাজতের দিকে, শম্ভু ব্যাকুল হয়ে লোকনাথের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে, অন্য মেয়েটি তার এই নিরুপায় ব্যাকুলতার দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসছিল। সে এক বীভৎস নিষ্ঠুর হাসি, সে হাসি, সম্ভবত মেয়েদের মুখেই মানায়।

কাননবালা একটু দূরে বারান্দার ধারে গিয়ে জগদীশের কাছে দাঁড়াল। বললে, ও কি কথা আপনার? ঠাকুরের সঙ্গে নাম করলে আমাদের পাপ হবে যে।

চাপা গলায় জগদীশ বললে, দেখলি সোমনাথ, দেখলি, ধর্ম্মে মতি কা'কে বলে? লোকনাথটা ধর্ম্মের ঘরে সিঁধ কাটতে গিয়েছিল,

শালার নরকেও ঠাঁই হবে না। বড্ড মদ খাইয়েছিল তোমাকে নয় মা? উঃ কি চসমখোর, চোখের চামড়া নেই!

তার উত্তরে কাননবালা লোকনাথের প্রতি যে ভাষায় কটূক্তি করতে লাগল, সে ভাষা আমাদের রুচিপ্রচারক 'সুনীতি-সঙ্ঘের' উন্নাসিক নীতিবিদ্‌রাও জানেন না।

কিছুক্ষণ পরে কাননবালা ঠাণ্ডা হোলো। জগদীশ তারস্বরে তাকে 'মা মা' ব'লে ডেকে কথঞ্চিৎ প্রশান্ত করেছে। স্থির হয়ে সে বললে, প্রায়ই যেতো আমার ঘরে, চুরি করার মতলব কিন্তু ফেঁয়ু পাইনি। আমাদের চোখে ধুলো দেবার জো-টি নেই। গরীব ব'লে কতবার আমার কাছে ব'সে কান্নাকাটি করেছে, মাইরি বলছি। আমার ঘরে আসে, আচার ব্যাভার মিষ্টি, খোসামুদ করে, পদ্য শোনায়—টাকার তাগাদা আর করিনে। যাক্ গে, টাকা ত ময়লা! কেমন যেন ভালোও লাগত লোকটাকে। কতদিন বলেছে, খেতে পাইনি—তক্ষুনি রেঁধে দিয়েছি! ওমা, পেটে পেটে তোমার এমন শয়তানি! পুরুষ বড় শঠ।

জগদীশ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বললে, মা এবার রক্ষে করো, বিপদে তুমি রক্ষে করো মা পায়ে ক'রে বৈতরণী পার ক'রে দাও এবারের মতন।

ও কি কথা গা? গলায় পৈতে দেখা যাচ্ছে, বামুনের ছেলে! বড়ো মুখে ছোট কথা কও কেন?

ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টিতে আবেগে-উদ্বেলিত কণ্ঠে জগদীশ বললে, সন্তান আমরা, এখানে জাতিবিচার নেই মা। কে বলেছে তুমি পতিতা, বিশ্বের সকল কলঙ্ক, মানুষের দুরপনেয় লজ্জার ভার মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছ, তুমি উদাসীন, তুমি সন্ন্যাসিনী—তোমার এক হাতে সুধাপাত্র, অন্য হাতে বিষভাণ্ড—

অলক্ষ্যে এতক্ষণে শম্ভুর মুখে হাসি ফুট্‌ল। কাননবালা খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে জগদীশের মুখের দিকে তাকাল, জগদীশ ততক্ষণ অভিনয়-উচ্ছ্বাসের দ্বারা সুচতুরভাবে নিজের চোখে জল টেনে এনেছে।

আমি বললাম, মিনতি করছি, যেমন করেই হোক লোকনাথকে বাঁচিয়ে দিন্।

কাননবালা বললে, আমি কি করব বলুন, আমি ত আর ধরাইনি। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এমন কাজ করলে—চুরি করলে কি আর কেউ ছেড়ে কথা কয়?

জগদীশ বললে, তবে কে ধরিয়ে দিয়েছে মা?

ওই ত বাড়ীউলি বসে রয়েছে, ওরাই। আমার কি তখন হুঁস ছিল? ওরা বলে লোকটা মদের সঙ্গে আমাকে মফিয়া খাইয়েছিল।—তারপর চাপা গলায় কাননবালা বললে, আমি বারন করেছিলুম। বলি, হার ত আর যায়নি তখন পুলিশে আর দেওয়া কেন, ওরা কিছুতে শুনলে না।

যাই হোক, অনেক পরামর্শ, প্রার্থনা, যুক্তি, নাকখৎ, বক্তৃতা,—এবং শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের নামে দারোগাবাবু ও কাননবালার ব্যবস্থায় স্থির হোলো পুলিশের ফণ্ডে কিছু জরিমানা এবং কাননবালার বাড়ীওয়ালীদের কিছু আক্কেলসেলামী, এই জোগাড় ক'রে এনে দিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আর কেস্ উঠবে না,—লোকনাথকে ক্ষমা চাইয়ে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কত টাকা?

কথাবার্ত্তার আভাসে জানা গেল, অন্তত দুশো টাকা! ভয়ে আমাদের প্রাণের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত শুকিয়ে ধূ ধূ ক'রে উঠ্‌ল। দুশো টাকা আমাদের কাছে স্বপ্ন, দুশো টাকা আমাদের পক্ষে এক মহাসমুদ্র।

বুকের ভিতর ধক্ ধক্ ক'রে একপ্রকার 'শব্দ হতে লাগল, আতঙ্কে চোখের তারা কাঁপছে।

পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে টাকার কথা ভাবছিলাম এমন সময় দারোগা এসে বললেন, একজন আসুন, আসামীকে একবার দেখে যেতে পারেন আপনাদের কেউ।

পাশেই হাজত, জগদীশই মুখপাত্র হিসেবে গেল। আমরা কাছাকাছি রইলাম। কাননবালা মৃদুকণ্ঠে আমাদের দু'জনকে শুনিয়ে বললে, কিছু টাকা ধ'রে দিন আপনারা, আমি-ব'লে ক'য়ে মিটিয়ে দিতে পারব।—তার পর অধিকতর মৃদুকণ্ঠে পুনরায় তার বাড়ীওয়ালীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, আমার ওপর ও-মাগির হিংসে বুঝলেন? লোকনাথকে ও দেখতে পারে না, এবার রাগ তুলবে। ভারি তাঁদোড় মেয়েমানুষ।— এই ব'লে সে বাড়ীওয়ালীর পাশে বসল।

হাজতের দরজাটা পশ্চিম দিকে ফেরানো। দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না বটে কিন্তু দুজনের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

জগদীশ হেসে বললে, কি রে জাত খোয়ালি পেট ভরাতে পারলিনে? দূত্তোর!

লোকনাথ ভিতর থেকে উল্লাসিত কণ্ঠে বললে, হারটা বিক্রি করলে কতই আর হোতো! এ বাবা বেশ রইলুম। সরকারি হোটেলের ভাত অন্তত দু'বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। খুনের দায়ে পড়লে আরো ভালো হোতো, চোদ্দ বছরের জন্য স্বরাজ-লাভ। কাল সন্ধ্যে পর্য্যন্ত 'স্বাধীনতা' আপিসে ধন্না দিয়েছিলুম ভাই, একটি পয়সাও দিলেনা ব্যাটারা। আমার বউয়ের ওখানে একটা খবর পাঠাস, বলিস 'স্বদেশী ডাকাতি' করতে গিয়ে তোমার স্বামীদেবতা গ্রেপ্তার হয়েছেন!

পাগ্‌লি কিন্তু বিশ্বাস করবে না ভাই, এই যা দুঃখ!—বলতে বলতে সে হেসে উঠ্‌ল। হাসির শব্দে তার কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই,—সে যেন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

জগদীশের সঙ্গে আমরা বেরিয়ে এলাম। দারোগাবাবু ব'লে দিলেন, এত ক'রে যখন বললেন, তিনটে পর্য্যন্ত সময় রইল, তারপরে কিন্তু আসামীকে আদালতে পাঠিয়ে দিতে হবে জগদীশবাবু, এখানে রাখার হুকুম নেই। মনে রাখবেন।

পথে নেমে পরস্পরে আমরা মুখ চাওয়াচায়ি করে বললাম, কিন্তু টাকা? বেলা বারোটা বাজে,—এইটুকুর মধ্যে টাকা কোথায়, পাওয়া যাবে?

শম্ভু বললে, আমার সন্ধানে পাঁচটা টাকা আছে এনে দেবো।

জগদীশ বললে, কিন্তু পাঁচ ইনটু চল্লিশ যে চাই। আমি বৌদিদির কাছে পঁচিশ টাকা নিতে পারব, তিনি স্বামীজির কাজ থেকে বজবজ যাতায়াতের মোটর ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তারপর?

আমি বললাম, তোমার কাছে আমার স্যুট্‌কেস, তার মধ্যে পাবে একটা হাতঘড়ি! সস্তায় বেচলেও গোটা তিরিশ পেতে পারো,—কিন্তু তারপর?

জগদীশ বললে, সময় নেই তুই চলে যা সোমনাথ। প্রথমে যাবি বঙ্কিমের কাছে, তারপর মা, তারপর যাবি স্বামীজির ওখানে। শম্ভু তুই যা বেলেঘাটায়। আমি হাতঘড়ি বেচে যাবো বৌদিদির বাড়ী।

তিনজনে তীরবেগে তিনদিকে ছুটলাম। কথা রইল, আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে থানার দরজায় মীট্‌ করব।

ভাগ্য বিমুখ, আশা মরিচিকা। বঙ্কিমকে পাওয়া গেল না, হঠাৎ কী কাজে সে ধানবাদে রওনা হয়েছে। মাথাটা ঘুরে উঠল। বঙ্কিমের

আশাই বেশি রকম করেছিলাম। তারপর ? কোথায় যাবো ? রাস্তাঘাট যেন চোখের উপর লাফাচ্ছে। সময় যে বড় কম ! এর মধ্যেই আধঘণ্টা কাটল। আকাশ গুমোট,—না বৃষ্টি না রোদ। ছুটলাম বঙ্কিমের দরজা থেকে। মা—মা'র ওখানেই যাব। দৌড়, দৌড়, দৌড়। হাঁটবার সময় নেই, সময় নেই নিশ্বাস নেবার। টাকা, টাকা, টাকা। টাকা মানে আজ ধর্ম্ম, টাকা মানে ভগবানের অস্তিত্ব।

সময় নেই। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লোকনাথ দূরে স'রে যাচ্ছে—যাচ্ছে নৈতিক মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের দিকে। দারিদ্র্যের প্রতিবাদ করেছে সে আত্ম-নির্য্যাতনে, আত্মঅপমানে। বিদ্রূপ করেছে সে মনুষ্যত্বকে, ব্যঙ্গ করেছে বিধাতাকে !—সময় নেই, ছুটতে ছুটতে চলেছি।

পথে হঠাৎ বাধা পড়ল। ফিরে দেখি সাহিত্যিক বাণীপদ।

কোথায় চলেছ সোমনাথ ? কে তাড়া করেছে পিছনে ?

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে হাসতে হোলো। অতি কষ্টের হাসি, ক্লিষ্ট ভদ্রতার হাসি। নিজের হাসির প্রতিবাদ করলাম নিজে। বলব নাকি তোকে ? চাইব নাকি ভিক্ষা ?—বললাম, বিশেষ কাজে বিশেষ তাড়াতাড়ি। ভালো ত' ?

হেসে মধুর কণ্ঠে সে বললে, হ্যাঁ, ভালো।

ভালো ত' বটেই। তার চেয়ে ভালো সংসারে আর কে ? যা কিছু সুন্দর তার মধ্যে সে বাস করে। দক্ষিণ বাতাসের পাল তুলে সে ভেসে ভেসে বেড়ায় ; ফুলের গন্ধে, মৌমাছির গুঞ্জনে তার অলস মন্থর বেলা যায় কেটে। সে ভালো, সে খুব ভালো, যুগযুগান্তরের ভালো তার মধ্যে,—বিধাতার এই দুঃখময় বিপুল সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে ভালো সে। ভালোর ভিতরেই সে যেন দীর্ঘজীবী শ্রীজীবী হয়ে থাকে।

চাইতে কিছুই পারলাম না, হেসেই চ'লে গেলাম। কেন চাইব তার কাছে? চাইলেই সে দেবে, কিন্তু কেন নেবো তার সেই পরম অনুগ্রহের দান? আমাদের সে অনুগ্রহ করে, প্রশংসা করে,—কিন্তু জানি তার অসীম ঔদাসীন্য আমাদের প্রতি। সে অভিজাত সমাজের মানুষ; দরিদ্রের প্রতি, সহায়হীন দুঃস্থের প্রতি তার অনন্ত তাচ্ছিল্য, অপরিমেয় কৃপা। মূঢ় ম্লান মূক মানুষের উপরে সে কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে, কিন্তু সে-কবিতা তার অবকাশরঞ্জিনী, তার খেয়াল-খুসির ছন্দোবদ্ধ অনুকম্পা। সৌখীন সমাজের চিত্তবিলাস তার আর্টের উপাদান, এই তার গৌরব, এই তার সাহিত্য। তার সমস্ত রচনার মধ্যে জনসাধারণের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা, আমাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবহেলা। অবহেলায় সে বড় হয়ে উঠেছে, আপন সমাজের অভিজাত্য বাঁচাবার জন্য নিষ্ঠুরভাবে সে করুণা করেছে তাদের, যারা তার অভিজাত্য রক্ষার মূল ভিত্তি। তার ভিতরে বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, আছে অনুগ্রাহক, আছে এক ভিক্ষাদাতা ব্যক্তি! সে বড় ব'লে আর সবাই তার কাছে ছোট হয়ে গেছে।

ছুটতে ছুটতে চললাম। এক ঘণ্টারো উপর কেটে গেল। সময় অতি অল্প। ঊর্দ্ধশ্বাসে, অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো। টাকা চাই, টাকা। টাকা মানে বন্ধুত্ব, টাকা মনুষ্যত্ব, টাকা জীবন।

পথ ঘুরে মা'র বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে ঢুকতে গিয়ে পা দুখানা চলৎশক্তিহীন হয়ে গেল। বিপদের গুরুত্বের কথা জানালেই তিনি হয়ত টাকা দেবেন কিন্তু—কিন্তু সুযোগ নেবো তাঁর অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের? সুবিধা নেবো উদার বাৎসল্যের? কেমন ক'রে, জানাব, আমরা তাঁর কলঙ্কময় সন্তান, আমরা বর্ব্বর, দুর্নীতিপরায়ণ, আমরা মাতাল, বেশ্যার গলা থেকে হার ছিনিয়ে পালাই! কেমন

ক'রে তাঁকে বল্‌ব, তুমি আমাদের সম্বন্ধে যা জেনে রেখেছ মা, আমরা তা নই, আমরা শিক্ষিত নই, ভদ্র নই, চরিত্রবান নই, ধার্ম্মিক নই। চিত্তের মালিন্য প্রকাশ করা আমাদের কাজ, দুর্নীতি নিয়ে বিলাস করা আমাদের ধর্ম্ম, চৌর্য্যবৃত্তি ও দেহলালসায় আপন আত্মাকে কলুষিত করাই আমাদের রীতি। তুমি যা জেনে রেখেছ তা ভুল, অসত্য। আমরা তোমার পতিত সন্তান?

ফিরে চললাম দরজা থেকে। বাঁচাতে পারা গেল না লোক-নাথকে। কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে কারাবরণ যদি সে করেই তবে দুঃখ করবার কিছু নেই,—এই তার পথ। উদাহরণ হয়ে থাক্ সে দারিদ্র্যের,—শুধু দারিদ্র্যের নয়, শোষণতন্ত্রের; ধনিক-সম্প্রদায়ের নির্দ্দয় নির্য্যাতনের সাক্ষী থাক্ সে, ধন-বৈষম্যের ভয়াবহ পরিণামের প্রতীক্ সে। দেশের অপরিমেয় অধঃপতনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লোকনাথ!

অবশেষে নিরুপায় হয়ে, ব্যর্থ হয়ে,—মান, অভিমান, অপমানবোধ এক সময় সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে, লজ্জা ও সঙ্কোচের টুঁটি টিপে, অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য বিসর্জ্জন দিয়ে, নতমস্তকে ভিখারীর মতো পিতৃদেবের বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হলাম। তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন, রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন—তবু আজ তাঁর পায়ে ধরব, তাঁর শাসন আর নির্দ্দেশ মেনে নেবো, ভিক্ষা চাইব ভিখারীর মতো,—সকল দর্প আমার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে না এসে লোকনাথকে বাঁচাবার আর কোনো উপায়ই ছিল না। আগে লোকনাথ বাঁচুক।

নিজেই নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিলাম। দরজা ভেজানো, ঠেলে ঢুকলাম ভিতরে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, ধূলায় ধূসর। প্রথমেই দেখা গেল দুখীরামকে, একটা খাটিয়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে সে বাইরের ঘরে

ঘুমোচ্ছে। এত গরমে চাদর মুড়ি? বোঝা গেল ম্যালেরিয়া। আমার পায়ের শব্দ সে শুনতে পায়নি। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, কোথাও সাড়া শব্দ নেই। বাড়ীর পাশের অংশটায় ভাড়া থাকে, এদিকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

সময় বড় কম, মুহূর্ত্তের চূড়ায় চূড়ায় ছুটে যেতে হবে। এদিক ওদিক তাকিয়ে পিতৃদেবের সন্ধানে সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গেলাম। না, বাড়ীতে কেউ নেই বটে। চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে। সময় ত নেই, অপেক্ষা করব কতক্ষণ? মিনিট দুই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আজ আমি পরিত্যক্ত, এই বাড়ীঘর, আসবাব-পরিচ্ছদ, এদের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এরা আর আমার কেউ নয়। আমি যে ধনাঢ্যের পুত্র একথা ভুলেই গেছি। যিনি আমার সকলের চেয়ে আপন, তিনি এখন সকলের চেয়ে দূরে। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে একদিকে চেয়ে রইলাম।

অকস্মাৎ প্রবল ভূমিকম্পে এক সময়ে মনটা দুলে উঠ্‌ল। প্রচণ্ড আন্দোলনে আমার বহুসাধনায় প্রতিষ্ঠিত ন্যায় ও নীতির অসংখ্য ভিত্তিগুলি তাসের ঘরের মতো মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙে পড়ল। পিতৃদেবের শয়নকক্ষের ভিতরে তাকালাম। না, এখন কেউ নেই, কেউ দেখবে না। ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল আমার চোখ, এবং পর মুহূর্ত্তেই ভুতাবিষ্টের মতো ঘরের ভিতরে গিয়ে ক্যাশবাক্সর কাছে দাঁড়ালাম। এই ত অপূর্ব্ব অবসর!

দরজা পার হতে গিয়ে দুখীরাম জেগে উঠ্‌ল। উচ্চকণ্ঠে বললে, কে রে? কে যাচ্ছে বেরিয়ে?

তাকে আমি চিরকাল চিনি। উত্তর না দিলে এখুনি হয়ত চেঁচামেচি ক'রে একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে। বার্দ্ধক্যের সম্বল চীৎকার। থমকে দাঁড়িয়ে ভিতরে মুখ বাড়িয়ে বললাম, আমি রে দুখীরাম, তোর বুঝি অসুখ করেছে ?

পরক্ষণেই সে হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—দাদাভাই, তুমি··· এ কি চেহারা হয়েছে তোমার ? এতদিন—

থাম্ দুখীরাম, বাবা কোথায় আগে বল্।

তোমার বাবা,—আজ তাঁর মকদ্দমার দিন। ধড়মড় ক'রে সে উঠে এল। তার হাত এড়ানো দায়।

বললাম, তোদের খবর নিতে এসেছিলুম। ম্যালেরিয়া জ্বর ত, কালকেই সেরে যাবে. শোন্ দুখীরাম, তোকে একটা কাজ করতে হবে কিন্তু।—পা দুটো তখনো আমার আতঙ্কে কাঁপছিল।

দুখীরাম স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। বললাম, দেখা যখন হোলো না তখন তাঁকে আর জানিয়ে কাজ নেই যে আমি এসেছিলুম। তুই দিব্য ক'রে বল্ ত, আমি যে এসেছিলুম কোনোদিন তাঁকে বলবিনে ?

কম্পিতকণ্ঠে দুখীরাম বললে, বারণ কচ্ছ যখন, বেশ, বলব না।

যদি কোনো বিপদ ঘটে তোর তাহলেও বলবিনে ত ?

না।

আজ তবে চললুম। বড় তাড়াতাড়ি। কিছু মনে করিসনে ! আবার দেখা হবে। তাকে উত্তর দেবার সময় আর না দিয়ে আমি বিদ্যুৎবেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে কিছুদূর এসে দেখা গেল, বেলা আড়াইটে বেজে গেছে। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, সপ সপ ক'রে বৃষ্টি নেমেছে। দ্রুত চলেছি,

কিন্তু চোখে আর আমার কোনো ভাষা নেই, আশা নেই। কেমন যেন মনে হতে লাগল, 'এ পৃথিবীর সমস্তটা লাল, গভীর লাল, অবর্ণনীয় লাল। আমার হাত, পা, সর্ব্বশরীর খুনের রক্তে রাঙা। আমি খুন করেছি আপন চরিত্রকে, খুন করেছি নিজেকে। রক্তে অবগাহন করেছে আমার আত্মা।

জানিনে কেন চোখে আমার জল আসছে। আমি ত বিজয়ী, কৃতকার্য্য, বাঁচাতে পারলাম একজনকে চিরদিনের অপমানের হাত থেকে। তবে কেন উত্তপ্ত অশ্রু জমে উঠ্‌ছে চোখে ধীরে ধীরে কেন বুকের পাঁজরের মধ্যে এত ব্যথা, এত কাঁটা? কেন হঠাৎ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভিতরটা হা হা ক'রে উঠ্‌ছে? কেন, কেন, কেন?

৪

লোকনাথের কলঙ্কের কাহিনীটা শুনে পুষ্পরাণী হাউমাউ ক'রে খানিকক্ষণ কাঁদল, তার তীব্র ও দীর্ঘ চীৎকারে পাড়ার লোক এসে জড়ো হোলো। চরিত্রহীন জামাতা বাবাজীবনের প্রতি মাসি সনাতনী ভাষায় গাল পাড়তে লাগলেন। পাড়ার লোক মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে বলতে লাগল, আহা, পুরুষ মানুষ না হয় একটা অন্যায় করেই বসেছে, তার জন্যে আর অত কেন বাছা? তোমাদের সবই বাড়াবাড়ি।

পুষ্পরাণী বললে, আমি আফিঙ খেয়ে মরব।

কিন্তু আত্মহত্যা যারা করে তারা পূর্ব্বাহ্নে ঘোষণা করে না। পুষ্পরাণী আফিঙ খেল না বটে, কিন্তু দেখা গেল, জিনিসপত্র বাক্স

তোরঙ্গ নিয়ে পরের দিন সে বাপের বাড়ী রওনা হোলো। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সে যে আলোকপ্রাপ্তা মেয়ের মতো চরিত্রহীন স্বামীকে ছেড়ে গেল তা নয়, খুনে-ফাঁসুড়ে মানুষের হাত থেকে নিজের জিনিসপত্র ও সোনার গহনাগুলি বাঁচিয়ে নিয়ে চল্‌ল, এই মাত্র। বললে, অমন সোয়ামীর যদি আবার মুখ দেখি তবে আমি বাউনের মেয়ে নই, এই তোমাদের ব'লে গেলুম। গাড়ী চাপা মরুক।

লোকনাথ আমাদের কাছে এসে বললে, বাঁচলুম বাবা। অমন স্ত্রীলোক আমার অসহ্য।

তার এই রূঢ় স্পষ্টবাদিতায় জগদীশ পর্য্যন্ত আহত হোলো, বললে, স্ত্রীর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে নেই লোকনাথ।

স্ত্রী? স্ত্রী বলো তুমি ওকে? এদের মতন মেয়েকে নিয়ে তুমি ঘর করতে পার?—লোকনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল, নতুন-নতুন এদের চেনা যায়না, বিনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের কথা 'কয়, পতি পরম-গুরুমার্কা চিরুণী মাথায় চড়িয়ে স্বামী-সোহাগিনীরা পদসেবা করতে বসে। কপালে টিপ পরে, পায়ে আল্‌তা মেখে পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে ওরা মনে করে পুরুষ-জীবনে ও-ছাড়া বুঝি আর আনন্দ নেই। এমনি করেই ওরা আমাদের কুকুর বানিয়ে রাখে। তারপর, বুঝলে জগদীশ, কিছুকাল বাদে দেখতে পাই ওদের প্রকৃত চেহারা।

জগদীশ বললে, তোর মতো লোকের গালাগালি দেবার অধিকার নেই লোকনাথ। তারা আমাদের যোগ্য নয়, কিন্তু আমরাই বা তাদের যোগ্য কিসে?

লোকনাথ হাসল। বললে, এবার যা বল্‌ব সে তোমারই কথা জগদীশ। তাদের যোগ্য হয়ে ওঠার সময় নেই আমাদের, আমাদের অনেক কাজ, কিন্তু আমাদের যোগ্য হয়ে ওঠাই তাদের একমাত্র

সাধনা হওয়া উচিত। যা কিছু সৃষ্টি সবই পুরুষের, সমস্ত পৃথিবীই আমাদের। এখানে মেয়েদের ঠাঁই আছে কিন্তু অধিকার নেই। তাদের রূপ আর যৌবন কিসে আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে, এই তপস্যাই মেয়েদের।

কিন্তু ভালোবাসার বেলা কেঁদে মরিস কেন? কেন তাদের পায়ে ধরতে যাস?

ওটা মায়া, ওটাই রস। কাঁদিনে ভালোবাসার জন্যে, পুরুষ কাঁদে সন্তানের আশায়, সৃষ্টির ব্যথায়, প্রতিনিধির প্রয়োজনে। চোখ মেলে চেয়ে ছাখো, জীবনের সহজ অর্থ টা কী।

কিন্তু যে অমৃতটা হৃদয়ের?

আজ লোকনাথ হঠাৎ যেন দার্শনিক হয়ে উঠ্ল। জ্ঞানী পণ্ডিতের মতো বললে, সেটা পুরুষের। পুরুষ বিতরণ করে অমৃত, মেয়েরা দাক্ষিণ্য। আমাদের হৃদয়, তাদের মন। আমাদের পেয়ে তাদের মন খুসি হয়, কিন্তু তাদের পেয়ে আমাদের হৃদয়ে জেগে ওঠে অনির্ব্বাণ অতৃপ্তি। এই বৃহৎ অতৃপ্তি আর ক্ষুধাই আমাদের উন্নতির সোপান। মেয়েরা মনের মানুষ খুঁজে পায় সহজে কিন্তু আমরা কি পাই আমাদের মানসীকে? দুর্লভের দিকে আমাদের সাধনা, মেয়েদের তপস্যা লভ্যের প্রতি, অনির্দ্দিষ্টের প্রতি। দেখলে ত তোমরা পুষ্পরাণীকে। এমন স্বার্থপর, লোভী, অনুদার, অশিক্ষিত স্ত্রীলোক তোমরা অবশ্য অনেক দেখেছ, অথচ একেই আমি আমার ধ্যানে, চিন্তায় এবং প্রত্যহের জীবন-যাত্রায় আদর্শ নারী ব'লে পূজা করেছিলাম। পূজাটা পড়ল অপাত্রে—

অপাত্র সে, না তুই? শ্রদ্ধা পেতে গেলে শ্রদ্ধা দিতে হয়, শ্রদ্ধেয় হতে হয় লোকনাথ।

শ্রদ্ধা দিতে যাব দেহসর্ব্বস্ব পুষ্পরাণীদের ? মরুভূমির ওপরে বর্ষণ ? ব'লো না তার কথা জগদীশ, আমার মোহ ভেঙে গেছে। মেয়েরা আসলে এক, তফাৎ কেবল চামড়ার, কেবল পোষাকের। শিক্ষিতা আর অশিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে প্রভেদটা কোথায় শুনি ? একজনকে দেখলে আসে বিতৃষ্ণা, অন্যজনকে দেখলে আসে বৈরাগ্য।

জগদীশ আর আমি হেসে উঠলাম। হাসিটা লোকনাথের ভাল লাগল না। সে উঠে দাঁড়াল, তারপর বললে, অথচ এই ছোটাছুটি চলবে চিরকাল, যেমন গ্রহের সঙ্গে ফেরে উপগ্রহ। মুক্তি হবে কেমন ক'রে ? এই প্রবৃত্তি চিরদিন সক্রিয় ক'রে রেখেছে আমাদের। অথচ—অথচ তাদের সর্ব্বান্তঃকরণে আমি গ্রহণ করতে পারিনি, কোথায় একটা গোপন ঘৃণা তাদের সম্বন্ধে পোষণ করি, একটা বিজাতীয় আক্রোশ—

লোকনাথ একবার আমাদের মুখের দিকে তাকাল, যাবার সময় পুনরায় বললে, হ্যাঁ, একটা স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা, যুক্তিহীন, লক্ষ্যহীন। —এই ব'লে সে ক্লান্ত এবং অবসন্ন পদক্ষেপে বে'রিয়ে চ'লে গেল।

সন্ধ্যার একটা চাপা অন্ধকার দল বাঁধতে লাগল ধীরে ধীরে। বাইরের আকাশ মেঘময়, বাতাস নেই। এই ঘনায়মান অন্ধকারে ব'সে কেবলই যেন মনে হতে লাগল, লোকনাথের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। সংশয় এবং অবিশ্বাসে ক্ষত-বিক্ষত সে কিন্তু সে-কেবল মেয়েদের সম্বন্ধেই নয়, সংসারের সব কিছুর প্রতিই তার মন বিমুখ হয়ে উঠেছে। এখন থেকে বেঁচে থাকাটা তার পক্ষে কঠিন হবে, কঠিন হবে মানুষের সমাজে তার টিকে থাকা। কেবলমাত্র স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই তার মোহভঙ্গ হয়েছে তা নয়, নিজেও সে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, সমস্ত জীবন তার মালিন্যে ভ'রে গেছে, হলাহলে ভ'রে উঠেছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নিঃশব্দে বসে রইলাম। ভিতরে একটা গুমোট সৃষ্টি হয়েছে, বাইরেও জলকাদা, পথ দিয়ে চলবার উপায় নেই। জগদীশের পুরনো ছাতাটা মাথায় দিয়ে এবং আমার জুতোটা পরে শম্ভু বেরিয়ে পড়েছে, তার জন্যও অপেক্ষা করতে হবে।

জগদীশ এতক্ষণে সাড়া দিল। হাতটা তুলে আমার কাঁধের উপর রেখে বললে, মেয়েদের সঙ্গে অতি-পরিচয়ের ফল ফলেছে লোকনাথের জীবনে। এর নাম চরিত্রের বিকৃতি, মরবিডিটি। পরিণাম?—সে বোধহয় অন্ধকারে একটু হাসল, বললে, পরিণামে শোচনীয় মৃত্যু!

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে জগদীশই আগে ডাকল, মা?

তাঁর গলার সাড়া পাওয়া গেল। বললেন, ওই ঘরে বসো বাবা, আসছি। সোমনাথ আসেনি?

হ্যাঁ, এসেছে। ব'লে জগদীশ তাঁর পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকল, আমিও তার অনুসরণ ক'রে গিয়ে খাটের উপরে বসলাম।

আমাদের খোঁজ নেবার আগেই ভগবতী এসে দাঁড়াল। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি তার সাজসজ্জা, সম্ভবত একটু আগে সে সাবান মেখে স্নান ক'রে উঠেছে। চোখে ও মুখে তার একটি বিনম্র শুচিতা দেখলে মনে কেমন যেন একটি সম্ভ্রম আসে। আপন যৌবনের প্রাচুর্য্যে সে যেন লজ্জিত, কুণ্ঠিত। দেহের কোন অংশ পাছে দেখা যায় এজন্য সে সর্ব্বদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত। হাত দুখানা পর্য্যন্ত সে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে। ফল ও ফুলের ভারে সে যেন ঝুঁকে পড়েছে।

মুখ তুলে জগদীশ বললে, কেমন আছিস রে মিনু?

ভগবতী দুষ্টামির হাসি হেসে বললে, ভাল নেই।

কই, তা ত মনে হচ্ছে না। গায়ে সেরেছিস দেখা যাচ্ছে—বলতে বলতেই সে খপ ক'রে ভগবতীর হাতখানা ধরে ফেললে।

চক্ষুলজ্জা করবার মানুষ জগদীশ নয়। শোভনতা ও ভব্যতা এ দুটো শব্দের সহিত তার পরিচয় কম। প্রথম দিন থেকেই ভগবতীকে সে তুই-তুকারি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, তাকে কোনো রকমেই রেয়াৎ করে না, এমন কি তাকে চড়-চাপড়টা দিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না।

উঃ উঃ, ছাড়ো বড়দা, ছাড়ো, লাগছে—

জগদীশ তার মাথার খোঁপাটা খুলে দিল, তারপর চুলের মুঠি ধ'রে বললে, মুখপুড়ি, পাশের খবর বেরিয়েছে, নেমন্তন্ন করিসনি যে; বঙ্কিম ছাড়া কি দুনিয়ায় মানুষ নেই?

ঘাট হয়েছে বড়দা, এইবার তোমাকে পেট চিরে খাওয়াবো, ছাড়ো।

তার সজ্জাসমানের পরিচ্ছন্নতাটুকু জগদীশ নষ্ট ক'রে দিল, এবং তার একখানা হাতে পাঞ্জা কস্‌তে কস্‌তে বললে, পাশ করেছিস, এবার বিয়ে করবি ত?

ভগবতী তার পাশে বসে পড়ল। হেসে বললে, বিয়ে করব? কি দুঃখে?—চুলটা সে আবার ফিরিয়ে বাঁধতে লাগল।

তা ছাড়া তোদের আর কাজ কি বল। বিয়ে হবার জন্য তোরা তৈরী, পাশ করাটা উপরি গুণ।

কেন, স্বাধীন জীবিকা?

বড় কথা বলিসনে ভাই, ওটা তোদের নয়। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাটাও মেয়েদের কাছে রোমান্স, ওটা তাদের যথাসময়ে ফুরিয়ে

যায় অর্থাৎ মোহ ভাঙে। যদি ভালবাসায় প'ড়ে থাকিস তবে দেখবি, বাইরের জীবনটা তোর অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। তোদের চরম লক্ষ্য, ঘর বাঁধা, জীবিকা অর্জ্জন নয়।

এইবার ভগবতী আমার দিকে ফিরে বললে, সোমনাথদা চা খাবেন?

দিতে পারো। আজ ওটা জোটেনি সারাদিন।

জগদীশ বললে, এমন বাঙালীগঙ্গী অভ্যর্থনা শিখলি কবে থেকে? আমাদের চা খেতে দিয়ে তুই হারমোনিয়াম্ পেড়ে রবিঠাকুরের গান সুরু করবি, কেমন? মা বোধকরি পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পালিতা কন্যার গুণগান করবেন? এবং তারপরেই ঝড়ের মতো বঙ্কিম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে, আর তুই লজ্জাবতীর মতো নুইয়ে পড়বি, এই ত?

ভগবতী সোজা তার দিকে চেয়ে বললে, থামলে কেন বড়দা? তোমার দাঁতের ধার কম্‌ল কেন?

জগদীশ হেসে বললে, মেয়ে দেখলেই আমার ঝগড়া বাধাতে ইচ্ছে করে। জানিস ত—

খুসি হলুম শুনে। তাই ব'লে যারা ঝগড়া করে না তাদের কাছে বাহাদুরি দেখাবে? নরম মাটি, কেমন?

এমন সময় মা এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখের চেহারা দেখে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। চোখ দুটি তাঁর রাঙা। কেন রাঙা, সেকথা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করব না, সে সাহস নেই, তাঁর একটা দুর্ব্বোধ্য জায়গা আছে যেখানে আমাদের ভাষা পৌঁছয় না। আমরা দুঃখ বোধ করতে পারি, সান্ত্বনা দিতে পারিনে।

অন্যদিন তিনি হেসে কথা বলেন, আজ তাঁর মুখে কেমন একটি

ঔদাস্য। বললেন, তোমরা না এলে আমি ভাবিত হই জগদীশ, ভাবছিলুম, তোমাদের কাছে খবর পাঠাবো। তোমার ছেলেটি কেমন আছে? খবর পেলে কিছু?

জগদীশের বাচালতা কখন্ অন্তর্হিত হয়েছিল। মাথা নিচু ক'রে বললে, সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম, খবর ভাল নয়।

ভাল নয়? চিঠি পেয়েছ?

হেমন্ত চিঠি দিয়েছেন, সত্বর যাবার জন্যে বলেছেন।

বেশ, এখুনি যাও। মিনু, এদের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও ত মা। একেবারে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীর খোঁজ নিয়ো।

মিনু উঠে দ্রুতপদে চ'লে গেল। মা মুখ ফিরিয়ে বললেন, বিপদে একা যেয়ো না। সোমনাথ, তুইও যা বাবা জগদীশের সঙ্গে। তেমন কিছু দেখা গেলে আমাকে তার করিস; গিয়ে পড়ব—কেমন?

আমরা সবিনয়ে সম্মত হলাম। মা পুনরায় বললেন, দুঃখের সন্তান, মা-মরা সন্তান, তাকে তোরা বাঁচিয়ে তুলিস বাবা।—এই ব'লে তিনি আলমারি খুলে একগোছা নোট্ বা'র করলেন।

তাঁর এই উদার বিবেচনা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর টাকা বা'র করা দেখে জগদীশ প্রতিবাদ করল না, প্রতিবাদ জানালে তিরস্কারের ভয় আছে, সে নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে রইল। এক সময় তাকে হাতও পাততে হলো, অর্দ্ধেকগুলি নোট্ মা তার হাতে দিয়ে বললেন, তোর ছেলের অসুখ শুনেই টাকা আনিয়েছিলুম। বলা যায় না ত, হয়ত হেমন্তদের হাতে এখন কিছু নেই। ছেলের চিকিৎসা যেন বন্ধ হয়না বাবা।

যার সন্তান এমন পীড়িত, এবং যেটি একমাত্র সন্তান, তার পক্ষে হাসি-তামাসা করাটা যে কী অসঙ্গত একথা জগদীশ ভালই জানে

কিন্তু তার বেপরোয়া চরিত্র কোনো বিপদেই বিপর্যস্ত হয় না। নিজের জন্যও নয়, পরের জন্যও নয়। দুর্যোগে, দুঃখে, বিপদে এমনি করেই তাকে হাসতে দেখেছি, রসিকতা করতে শুনেছি। স্ত্রীর মৃত্যু-দিনের কথাটা মনে পড়ে। নিজেকে সে সান্ত্বনা দেয়নি, পরের সহানুভূতি প্রার্থনা করেনি। বন্ধুবান্ধবের ভিতরে অমন সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা স্ত্রী আর কারো ছিল না। জগদীশ সেদিনো যেমন আজো তেমনি, ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে তার চরিত্র গড়া। সন্তানের এই সাংঘাতিক রোগের সংবাদটা আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সঙ্গে গোপন রাখতে দেখে ভগবতীও স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। জগদীশ তখন পরম তৃপ্তিতে আহার ক'রে চলেছে। এমন নির্লিপ্ত মানুষ সংসারের পক্ষে বিপজ্জনক।

আহারাদির পর যথাসময়ে আমরা যাত্রা করলাম। আজ সকাল থেকে চড়া রোদ ফুটেছে। গাড়ীর সময়টা জানতে পারা গেছে, অর্থাৎ সময় আর নেই, আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। দুখানা টিকিট কেটে গাড়ীতে ওঠার পর জগদীশ টাকাগুলো আমার হাতে দিয়ে বললে, তুই এগুলো রাখ্, সোমনাথ, আমার হাত সুড় সুড় করে খরচ করবার জন্যে। চাইলেও আমাকে দিসনে।

কিন্তু এ যে তোমার ছেলের অসুখের খরচ !

থাম্। বাৎসল্যটাকে খুঁচিয়ে জাগাসনে। ও আমার জানা আছে।

জানা তার সব। সংসারে জেনেছে সে অনেক ; সব জেনেই সে নির্বোধ, দায়িত্বজ্ঞানহীন। পাঁচটি ক'রে টাকা সে কাশীতে তার মায়ের কাছে কেন নিয়মিত আজো পাঠায় এই প্রশ্ন একদিন লোকনাথ তাকে করেছিল। উত্তরে সে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছিল, মাতৃভক্তি নয়, কর্ত্তব্যও নয়, জীবে দয়া !

ঘণ্টা দুই হোলো ট্রেণ ছেড়েছে। এতটা সময় সে প্রায় ঘুমিয়েই কাটাল। পথ প্রান্তর খাল বিল উত্তীর্ণ হয়ে গাড়ী চল্‌ছে। সেটা শনিবার।

কিন্তু ডেলি-প্যাসেঞ্জারের ভিড়ও এইবার ধীরে ধীরে কমে গেল। গাড়ীতে লোকজন অল্পই। আসবার সময় ভগবতী ছোট একটা স্যুটকেস দিয়েছে এবং একটি পুঁটুলি, এ ছাড়া আমাদের সঙ্গে আর কিছু নেই।

এইবার জগদীশ উঠে বসল। বললে, ছেলেকে গিয়ে ভালই দেখ্‌ব, ভয় পাসনে।

বললাম, ভয় তোমার যদি না থাকে আমার থাকবে কেন? আমার কিছু ভয় নেই।

একখানা কাপড়ে কিছু বেদানা আর কমলা লেবু ছিল, তার থেকে একটা লেবু নিয়ে ছাড়িয়ে এক কোয়া জগদীশ মুখে দিল এবং আর এককোয়া দিল আমার হাতে। তারপর বললে, আচ্ছা, বৌদিদিকে তোর কেমন মনে হয় রে সোমনাথ?

বললাম, বেশ সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী।

কথাটায় জগদীশের মুখে হাসি দেখা দিল। আমি সে কথা জিজ্ঞেস করছিনে তোকে, কেমন মানুষ তিনি তাই বল।

কেমন বললে তুমি খুসি হও?

জগদীশ কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে রইল। পুনরায় বললে, হ্যাঁ, তাঁর প্রশংসায় আমি খুসি হই বটে, এ এক অদ্ভুত রহস্য!—চেয়ে রইল সে উদাস হয়ে, উন্মনা হয়ে। এটা তার চিত্ত-চাঞ্চল্য নয়, চিত্ত-বৈলক্ষণ্য। যার প্রতি সে নির্ম্মম তার প্রতিই তার গোপন আকর্ষণ। বৌদিদির প্রতি তার প্রকাশ্য বিরোধিতা সর্ব্বজনবিদিত, নির্দ্দয় হাসি আর নিষ্ঠুর

সমালোচনায় প্রিয়ম্বদাকে ক্ষতবিক্ষত করা তার কাজ, অকারণ ব্যঙ্গে স্ত্রীলোকদের খেলো ক'রে দেওয়া তার একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি,—এ সবই জানি, কিন্তু যেটা জানিনে সেটা কেবল আমাদের কাছেই রহস্যময় নয়, তার কাছেও। সে আত্মবঞ্চনা করে না। কিন্তু নিজের ভিতরে এক এক সময় বিচিত্র চেহারা দেখে নিজেও সে বিস্মিত হয়।

জানি জগদীশ একজন উঁচুদরের নীতিবিদ্। কোথাও সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। রাজনীতিকদের প্রবল ভণ্ডামীর জন্য সে 'দেশপ্রেম' বিসর্জ্জন দিয়েছে, বিশেষ একটা দলের প্ররোচনায় কারাবরণ করার জন্য সে অনুতপ্ত। তার ধারণা, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে গেলে আগে জনকয়েক 'স্বদেশী স্বার্থান্বেষীকে' দেশ থেকে নির্ব্বাসন দেওয়া প্রয়োজন।

এদিকে চরিত্রের শুচিতা সম্বন্ধেও তার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের মতো। নরনারীর যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে তার মতামত অতি প্রাচীন। প্রেম ও ব্যভিচারের প্রতি সে খড়্গহস্ত। এমনি সে।

তোর কী মনে হয় প্রিয়ম্বদাকে বল্ ত?

তিনি আমাদের বৌদি, এই কেবল মনে হয়।

কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে?

অতি উন্নত। তরুণ সমাজের আদর্শ!

ইয়ার্কি করিসনে সোমনাথ।

এইবার আমি বললাম, তোমার কথাটা শুনবে? তুমি আমাদের মধ্যে একমাত্র রূপবান যুবক, অটুট স্বাস্থ্য, অসামান্য বুদ্ধি, অসাধারণ শিক্ষা। তোমার চরিত্রটাও ত ছোট নয় জগদীশদা।

জগদীশ অবাক হয়ে বললে, তোর এতদূর অধঃপতন হয়েছে

সোমনাথ ? প্রিয়ম্বদার আলোচনায় আমার প্রশংসাটা অত্যন্ত লজ্জাকর আর বে-আইনী।

বললাম, জগদীশদা, তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে এমন আমি বলিনে, কিন্তু তুমিই বলেছ মেয়েরা রূপের ভক্ত, তারুণ্যের ভক্ত। তারা যে সব সময় দেহের সম্পর্ক কামনা করে তাই নয়, তারা সৌন্দর্য্যের সংসর্গও চায়। এ তোমারই কথা, তোমারই মত।

তুই কি বলতে চাস প্রিয়ম্বদাও আমার সংসর্গ চান্ ?

চান্, কিন্তু এ কামনা তাঁর অতি নিগূঢ়। ওপরে তোমাদের বাদানুবাদ, বিতর্ক, এমনি ঝগড়া-বিবাদ কিন্তু ভেতরে তোমরা পরস্পরের সান্নিধ্যটাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করো।

একেই ত তোরা প্রেম বল্‌বি ?

না, এর নাম সাখীত্ব। এ প্রেমে দেহের প্রশ্ন নাই। প্রিয়ম্বদার নির্ব্বাচনশক্তি ভালো, তোমার মতো চরিত্রবান যুবককে বেছে নিয়েছেন। এখানে ভোগের আয়োজন কম, উপভোগাই বেশি।

জগদীশ হেসে বললে, বঙ্কিমের কথাটা মনে পড়ল। বঙ্কিম বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল প্রিয়ম্বদার সঙ্গে। কিন্তু অল্প বয়স কিনা, ছোকরার ধৈর্য্য কম। একদিন মাত্রা ডিঙিয়ে গেল ; ফলে, বন্ধুবিচ্ছেদ।

তুমি জানলে কি ক'রে ?

প্রিয়ম্বদার মুখে। কিন্তু বন্ধু-বিচ্ছেদের আসল কারণটা কেবলমাত্র আসক্তি নয়। মেয়েরা যেমন বুঝতে পারে এর মধ্যে হৃদয়ের কোনো কথা নেই তখনই ভদ্রনারীর মন উত্যক্ত হয়ে ওঠে। ব্যভিচারকে মেয়েরা সমর্থন করে একথা বলা আইনে বাধে কিন্তু দুর্নীতিমূলক প্রণয়ের মধ্যে মেয়েদের একটি গভীর ও অত্যুগ্র আনন্দ দেখা দেয়। এই মতবাদটা পৌরাণিক প্রাচীন ভারতের। ব্যভিচারীর বাঁশী

কালিন্দির কূলে বাজলেই প্রাণময়ী প্রিয়তমা কুল ছেড়ে অকূলের দিকে পাড়ি দিতেন ; কিন্তু উপায় কি বল্, মহাভারতের কথা অমৃত সমান !

হাসলাম তার কথার ভঙ্গিতে। হেসে বললাম, কিন্তু তুমি আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ।

জগদীশ বললে, আসল কথাটা বল্‌ব না। ও তত্ত্বটা আমি এখনো বুঝতে পারিনি এবং সম্ভবত প্রিয়ম্বদারো অজ্ঞাত।

কিন্তু তিনি যদি তোমাকে ভালোবেসে থাকেন ? যদি কাছে পেতে চান্ ?

খুসি হবো।

উষ্ণকণ্ঠে বললাম, তোমার নৈতিক বুদ্ধিতে বাধবে না ? তুমি না 'তুর্নীতি দমন সঙ্ঘের' একজন সভ্য ?

সেই জন্যই ত একটু সঙ্কোচ। ভাবচি তাদের তালিকায় এবার প্রিয়ম্বদার নামটাও তুলে দেবো।

এমন সময় ট্রেণ এসে ষ্টেশনে থাম্‌ল। বেলা পাঁচটা বাজে। স্যুটকেস ও পুঁটুলি নিয়ে নেমে প্রথমেই দেখা গেল, আকাশ কোমল কালো মেঘে আচ্ছন্ন। সম্ভবত আমাদের পথে বৃষ্টি নামবে। পল্লীগ্রামের ষ্টেশন, জনবহুল নয়। শহরের কোলাহল ও উদ্বেগের ভিতর থেকে এসে চারি-দিকের এই দূরবিস্তৃত নীল প্রান্তরের দিকে চেয়ে চোখ ও মন স্নিগ্ধ হয়ে এল। এমন মেঘ, তার নিচে এমন ঘনশ্যাম আকাশ অনেকদিন দেখিনি। ষ্টেশনের বাইরে এসে বললাম, হেঁটেই যাওয়া যাক্ জগদীশ।

তবে মাঠের ভিতর দিয়ে চল্।

তাই চলো। এখনো বেলা অনেকটা রয়েছে।

নিকটে চাষীদের কয়েকখানা দোকান। কাঁচা রাস্তা খানিকটা

পার হয়ে মাঠে এসে পড়া গেল। মেঘ ঘন হয়ে উঠতেই জোরে জোরে বাতাস বইতে লাগল। দিগন্তজোড়া ধানের ক্ষেত সেই বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু মাঠে নেমেই বোঝা গেল, চলবার উপায় নেই। বর্ষায় মাটি নরম, পা ব'সে যাবার সম্ভাবনা। তখন অগত্যা কাঁচা-পাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত হোলো। পথ কিছু বেশি ভাঙতে হবে।

পথে আমাদের নানা কথা, নানা আলোচনা চলছিল, কিন্তু সমস্ত অতিক্রম ক'রে আজ এই আসন্ন বর্ষার আকুলতার দিকে চেয়ে আমার মন ধান্যশীর্ষগুলির মতো আন্দোলিত হচ্ছে। কণ্ঠে কিছু জলের তৃষ্ণা ছিল কিন্তু স্নিগ্ধ বাতাসে প্রাণের মূল পর্যন্ত রসে সিক্ত হয়ে উঠতে লাগল, কোনো তৃষ্ণাই আর নেই। কেমন ক'রে যেন আজ সব ভাল লাগছে। ছোট গাছ, ছোট ছোট নামহারা ফুল, শীর্ণ দূর্বাদল, এই সঙ্কীর্ণ পথ, উড্ডীয়মান বকের সারি, দূরের বনশ্রেণী—মনে হোলো এরা যেন নিতান্তই আত্মীয়, এরা বন্ধু, এরা যেন সবাই আমাদের আলিঙ্গন করছে। এ কেবল পল্লীর শোভা নয়, সুলভ কাব্য নয়, ভাবের উচ্ছ্বাস নয়—এরা যেন আমাদের জীবনীশক্তি, আমাদের দুঃখময় উৎপীড়িত জীবনের সান্ত্বনা, আমাদের পরম আশ্রয়।

ছোট একটা সাঁকো পার হয়ে গ্রামের ভিতরে ঢুকলাম। গাছপালা ছাওয়া পথ, একটি পুরাতন মন্দির, নিকটে একটি পুকুর, কয়েকখানা গোলদারি দোকান, তাদের পাশে একটা ডাক্তারখানা। ডাক্তারখানা থেকে দু তিনটি লোক আমাদের দেখে বেরিয়ে এল। জগদীশ এ গ্রামের জামাই।

একটি ছোকরা দূরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আমাদের লক্ষ্য করছিল, এবার কাছে এসে জগদীশকে থামিয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে।

বললে, আপনি এই গাড়ীতে আসবেন মনে ক'রে ওঁরা সবাই অপেক্ষা করছেন।

জগদীশ বললে, বাঃ, তুই ত বেশ ভালো বাংলায় কথা বলিস রে?

ছোক্‌রা হেসে বললে, এইবার আপনাদের কল্‌কাতায় যাবো।

অমন কাজ ক'রো না বাবা, রাজধানীর বেকার সমস্যা আর বাড়িয়ো না! আয় সোমনাথ।

ছোকরাটি হেসে চ'লে গেল। আমরা আবার অগ্রসর হলাম। নবাগত দুই যুবককে দেখে এখানে ওখানে কানাকানি স্বরু হয়েচে। যদিচ আমরা ধুলিমলিন এবং পথশ্রমে বিপর্য্যস্ত তবুও আমাদের চেহারায় শহরের একটা ছাপ রয়ে গেছে। আমরা দূরের মানুষ, আমাদের ধাতুর সঙ্গে তাদের মিল নেই, তারা পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াতে লাগল।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে আমরা একবার দাঁড়ালাম। সুমুখে খানিকটা খোলা জায়গা। বাড়ীখানা দেখে মনে হোলো, অবস্থা এদের ভালোই। জগদীশের মতো হতভাগ্য পাত্রের সঙ্গে এরা কী আশায় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তাই ভাবতে ভাবতে দরজা পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

খবর পেয়ে যে সব স্ত্রী-পুরুষ এসে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন তাঁদের অনেককে জগদীশও চেনে না। কিন্তু দেখা গেল তা'র শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা এ বাড়ীতে কম নয়। তার স্বর্গীয় স্ত্রীর জন্য অনেকেই অশ্রুপাত করলেন। ছেলেটি কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বললেন, সেই একই অবস্থা বাবা, তুমি দেখবে চলো।

তিন মহলা প্রকাণ্ড বাড়ী। জগদীশের শ্বশুর নেই, শাশুড়ী আছেন।

দুইজন শ্যালকই বিদেশে চাকরী করে। এরা সবাই জ্ঞাতি-গোষ্ঠি। উপরে উঠে এসে একে একে সবাই নিজ নিজ মহলে অদৃশ্য হলেন। জগদীশ ও আমি তার শাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি বললেন, এ ছেলেটি কে বাবা?

এ আমার বন্ধু, সোমনাথ। হেমন্ত কই, তাকে দেখছিনে যে?

সে আছে তোমার ছেলের কাছে ব'সে। তোমরা ঘরে যাও বাবা। আমি রান্নার ব্যবস্থা করেই আসছি। এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।

আত্মীয়তায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। এ আমার কাছে নতুন। বললাম, আমি ওই খালি ঘরটায় বসি, তুমি আগে দেখা শোনা করো।

ভয় পাস কেন রে, কল্‌কাতার বদ্‌নাম হবে যে।

চুলোয় যাক্ কল্‌কাতা, ক্ষিধেয় আমার নাড়ি চোঁ চোঁ করছে। তোমার শ্বশুরবাড়ী আদর আছে, আহাঁর নেই।

চুপ, চুপ, কুটুম-বাড়ী এসে...হ্যাংলা কোথাকার।— তারপর সেও গলা নামিয়ে বললে, আমারো ক্ষিধে পেয়েছে, মাইরি।

তোমার ছেলে, তোমার শ্বশুরবাড়ী, তোমার ভাবনা কি বলো?

জগদীশ হেসে বললে, ছেলে! হ্যাঁ, ভুলেই গিছলাম ছেলেটা আমার, ওর জন্য একটা দায়িত্ব নেবার আছে। জন্মদাতা হওয়া সহজ, পিতা হওয়া বড় কঠিন। আয়।

বড় দালান পার হয়ে একটা ঘরের ভিতরে এসে আমরা দাঁড়ালাম। সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, ঘরে অন্ধকার জমেছে। জগদীশ সোজা গিয়ে বিছানার ধারে বসল। ঘরে আর কেউ নেই। রোগী জেগেই ছিল, জগদীশকে দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ছেলেটির বয়স আন্দাজ বছর চারেক, এত অসুখেও তার চেহারা বিশেষ ম্লান হয়নি। অবাক হয়ে অনিমেষ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল।

পিতা ও পুত্র!

কিন্তু অপরিচিত পিতা, বিদেশী পিতা, রক্তের সম্পর্ক আছে কিন্তু স্নেহের সম্পর্ক তৈরি হয়নি। তার এই ক্ষুদ্র জীবনে সে যে জগদীশকে কবে দেখেছে মনেই করতে পারছে না, কল্পনাই করছে না এই মানুষটা তার পরমাত্মীয়, এরই জন্য পৃথিবীতে সে আসতে পেরেছে। ছেলেটি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধে চেয়ে এদিক ওদিক মুখ ফিরাতে লাগল। কা'কে যেন খুঁজছে।

জগদীশ তার একটি হাত ধরে নাড়ল, কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিল। ওই পর্য্যন্ত, ওইটুকু তার পিতৃত্ব। তারপর বললে, এর মুখখানা এর মায়ের মতো হয়েছে, নারে সোমনাথ?

বললাম, জগদীশ, তোমার গলার মধ্যে জল জমেছে।

আমার?—জগদীশ গলা ঝাঁড়া দিল, পুনরায় বললে, পাগল, পাগল তুই সোমনাথ। মায়া যেখানে জন্মায়নি, প্রাণের সুর সেখানে আসবে কোথা থেকে?

এমন সময় আলো হাতে নিয়ে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। মুখ ফিরিয়ে তার দিকে চেয়ে জগদীশ সোজা হয়ে বসল। বললে, হেমন্ত, আমরা এসেছি যে?

চকিত আনন্দে মেয়েটি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ল। আলোটা নামিয়ে রেখে বললে, কি ভাগ্যি আমাদের। ছেলেটা না থাকলে কি আর আপনাকে আনা যেত জামাইবাবু?—এই ব'লে সে কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, আমাদের একেবারে ভুলে গেছেন আপনি।

প্রায় উঠে পালাবার চেষ্টা করছিলাম, জগদীশ আমার হাতখানা ধ'রে বললে, মেয়ে দেখলেই আমার বন্ধু গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে হেমন্ত, এর নাম সোমনাথ। ব'স্ চুপটি ক'রে। এরা বাঘ না

ভাল্লুক, শুনি? এটি কে বুঝতে পেরেছিস ত? শ্রীমতী শ্যালিকা, হেমন্তকুমারী!

নমস্কার বিনিময় হলো। হেমন্ত চট্ ক'রে বললে, মেয়ে দেখে ভয় পান্, এখনো বিয়ে করেননি বুঝি?

বিনীত কণ্ঠে বললাম, ভয় আমি পাইনি, জগদীশদা অমন বলে।

একেবারে কিন্তু মিথ্যে বলেননি।—ব'লে হেমন্ত তার ভগ্নিপতির কাছে এসে বসল। তার মাথাটা আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠ্‌ল। বলশালিনী মেয়ে। রুক্ষ চুলগুলি তার খোলা, পরণে একখানা রাঙা শাড়ী, হাতে সামান্য দুগাছি চুড়ি। আর কোথাও আভরণ কিছু নেই। শাড়ীখানা সর্ব্বাঙ্গে সে এমন ক'রে জড়িয়ে বসল যে, মনে হয়, তার গায়ে জামা নেই। পল্লীসভ্যতায় জামা পরাটা অশোভন।

ছেলেটার অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা উঠ্‌ল। আজ তেরো দিন ভারি জ্বর। ডাক্তার বলেছে, টাইফয়েড। বিষ্ণুপুর থেকে ডাক্তারবাবু একদিন অন্তর আসেন, প্রতিদিন তাঁর কাছে খবর পাঠানো হয়। ছেলেটি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মাথায় বরফ দেওয়া হয় না। পথ্য—ছানার জল।

বেদানা আর কমলালেবুর পুঁটুলিটা খুলে হেমন্ত খুসি হোলো। এগুলি বাৎসল্যের চিহ্ন। জগদীশ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, আমাদের মা এসব কিনে দিয়েছেন আসবার সময়। তুমি বিশ্বাস করো, নিজের গরজে আমি আনিনি।

হেমন্ত বললে, একথা কি সত্যি সোমনাথবাবু?

বললাম, খুব সত্যি। ও বরং ট্রেণে আসতে আসতে একটা লেবু নিজে ছাড়িয়ে খেয়েছে। অবশ্য আমাকেও ভাগ দিয়েছিল।

সবাই হাসলাম। জানি হাসাটা উচিত নয় এখানে। পরলোকগতা

এক নারীর একমাত্র পীড়িত সন্তানের নিকট বসে হাসাহাসিটা যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু এটা যে জগদীশের এলাকা, এখানে গাম্ভীর্য্য কিছু নেই, চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, প্রচলিত বিধি-নিষেধের আধিপত্য নেই।

ছেলেটি নিঃশব্দে এতক্ষণ আমাদের লক্ষ্য করছিল, জগদীশ তার শীর্ণ হাতখানি ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম রেখেছ এর ?

হেমন্ত বললে, ওর নাম বাবু।

এইবার মা এসে ঢুকলেন। হাতে তাঁর গ্রাম্য জলযোগের উপকরণ। বাড়ীর একটা চাকর আলাদা রেকাবে ফলমূল এনেছে। হেমন্ত উঠে গিয়ে দুখানা আসন পেতে দিল। এইবার আলোতে দেখা গেল, তার পরণের শাড়ীখানা ঠিক লাল নয়, রঙটা তার গৈরিক, রাঙা পাড়। রূপ ? রূপ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কঠিন বলিষ্ঠ তার দেহ, চওড়া হাড়, ছাড়ালো গড়ন, বলবান পুরুষের মতো তার স্বাস্থ্য। সে যেন বন্য বর্ব্বর দেশের মরুচারিণী মেয়ে। তার প্রতি পদক্ষেপে ঘরের মেঝেটা কাঁপতে লাগল। আমি কুণ্ঠিত হয়ে গেলাম।

মা বললেন, বাইরে জল আছে, হাত পা ধুয়ে এসো বাবা। আলোটা ধর্ ত কালাচাঁদ ?

আহারের পালাটা প্রথম দফায় সাঙ্গ হোলো। এটা ভূমিকা। আসল আহারটা বাকি। বাইরে এতক্ষণে ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি সুরু হোলো। গ্রাম এর মধ্যে নীরব হয়ে গেছে। গাছপালায় জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

হেমন্ত রেকাবে ক'রে পান এনে কাছে ধরল। বললাম, পান ত খাইনে ? আপনার জামাইবাবুকে দিন্।

খান্ না কেন শুনি ?

খাওয়াটা অভ্যাস করিনি।

বন্ধুর শ্বশুরবাড়ীতে এলে অনেক অভ্যাসই ভাঙতে হয়। ধরুণ।

প্রতিবাদ করবার সাহস নেই। পরের বাড়ী ব'লে নয়, কিন্তু আমার চেয়ে তার শারীরিক শক্তি অনেক বেশি। জগদীশের মতো আমিও একটা পান তুলে নিলাম। আমার বিপন্ন অবস্থায় জগদীশের মুখ চোখ খুসিতে ভ'রে উঠেছে। কিন্তু আমি খুসি হলাম না। সংসারে এমন আত্মীয়তা আছে যা মানুষকে উৎপীড়ন করে, তার রুচি এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে অসম্মান করে, তার ব্যক্তিত্বকে আঘাত করে। এ আত্মীয়তায় আমি সন্তুষ্ট হইনে। এমন ঘটনা নিত্যই দেখতে পাই, মেয়েদের অনুরোধ প্রায়ই আদেশ হয়ে দাঁড়ায়। সম্মান এবং প্রীতির সম্পর্কটা অবশেষে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক হয়ে উঠে। প্রতিজ্ঞা করলাম, রাত্রি প্রভাতে প্রথম সুযোগে আমি এদেশ ত্যাগ ক'রে যাব।

এতক্ষণ কাট্‌ল। এবার কিছু সহজ হতে পেরেছি। আস্তে আস্তে উঠে আমি বাইরে এলাম। আশ্চর্য্য, পিছনে পিছনে হেমন্তও উঠে এল। বললে, আপনি তামাক কি সিগারেট কিছু খান? আনিয়ে দেবো?

ওসব আমি খাইনে।—অর্থাৎ স্বীকার করতে সাহস হোলো না।

ও, আপনি আড়ালে যাচ্ছেন দেখে আমার কিন্তু তাই মনে হয়েছিল। দেখবেন, নতুন জায়গা, হোঁচট খেয়ে পড়বেন না যেন।—ব'লে সে আবার গিয়ে বসল।

পথ চিনে চিনে আমি নীচে নেমে এলাম। এবার ভালো লাগছে। খানিকটা একাকী থাকার সুযোগ না দিলে আমি নিতান্ত বিপর্য্যস্ত হই। এ বাড়ীটা প্রকাণ্ড। কতকগুলো দালান আর কতকগুলো মহল, অব্যবহৃত ঘরের সংখ্যাই বা কত, স্থায়ীভাবে কয়েকদিন না থাকলে এর হদিস পাওয়া যায় না। এতগুলি

লোকজন দেখা গেল, তারা যেন এই রহস্যপুরীর অতল তলে কোথায় তলিয়ে গেছে। এদিকটায় জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। বড় একটা গাছের শিকড় উঠান থেকে দালানের একটা কোণে উঠে এসেছে। মাটি আর শিকড়ের এক প্রকার ভিজা বন্য গন্ধ বাতাসে থম্‌থম্ করছে। পোকামাকড়ের টুক্-টাক্ আওয়াজ কানে আসছে। একে মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণের রাত, তার উপর গাছের ছায়া, অন্ধকারে এদিকটায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তবু ভালো লাগছে, তবু যেন মুক্তি পেয়েছি। আমি যেন কী ভাবছিলাম, কি যেন ভাববৈলক্ষণ্য ঘটেছিল, তার থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌ছি। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেয়ালটা ছুঁলাম, ঠাণ্ডা, হিম। দেয়ালটা পর্য্যন্ত অন্ধকার, কত উঁচু কে জানে, সেও যেন রহস্য-পুরীর অন্ধ প্রহরীর মতো আপন কর্ত্তব্য নিয়ে দণ্ডায়মান।

রাত্রির আহারের পর নিচের একটা বড় ঘরে আমাদের শোবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হোলো। কালাচাঁদ আর হেমন্ত দুজনে মিলে কোমর বেঁধে সেই রাত্রে সেই বহুদিনের অব্যবহৃত ঘরখানা ঝেড়ে মুছে ভদ্রলোকের যোগ্য ক'রে তুল্‌ল। খাট এল, বিছানা এল, জলের কুঁজো এল। তারপর নতুন ধোয়া মশারি এনে হেমন্ত নিজের হাতে টাঙিয়ে দিল। জগদীশ হেসে বললে, এত আদর অভ্যর্থনা সবই অপাত্রে পড়ছে, কি বলো হেমন্ত?

হেমন্ত বললে, ঠিক বলা যায় না জামাইবাবু, পাত্রের গুণ কি পাত্র নিজে জানে?

তবে ভাই এখানেই থেকে যাই বাকি জীবনটা। গরীব ব্রাহ্মণ, কোথায় আর পথে পথে ঘুরে বেড়াবো। কি বল্ সোমনাথ?

বললাম, কাল সকালে ক'টার গাড়ী?

হেমন্ত হাত থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকাল। তারপর বললে, খেয়ে পেট ভরেনি আপনার সোমনাথবাবু?

ভরেছে বৈ কি।—ব্যস্ত হয়ে বললাম।

তবে রাগ করছেন কেন?

রাগ?—হেসে বললাম, রাগ করব কেন? কালকে যাবার কথা শুধু বলছি।

কাল?—হেমন্ত হেসে ঘরখানা চুরমার ক'রে দিল, তারপর আলোটা রেখে পুনরায় বললে, এটা তবে জ্বালিয়েই রাখবেন জামাইবাবু। আজ আসি।—তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, কালকের কথা কালকে। আজ এখন ঘুমোন্ ত? একেবারে জলে পড়েন্ নি। এই ব'লে সে চ'লে গেল। জগদীশ দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।

বৃষ্টি আবার নাম্‌ল। আজ জলের শব্দটা পর্য্যন্ত যেন অদ্ভুত লাগছে। পাখীর ডানা ঝাপটের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, জানিনে সে পাখীটা কেমন! জলের এমন আর্ত্তনাদ কখনো শুনিনি এমন বর্ষা—এমন বর্ষা আমার জীবনে কখনো নামেনি। জান্‌লায়, দরজায়, দেয়ালে, বাইরের দিক দিগন্তে, আমার বিছানায়, জগদীশের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে দলে দলে যেন বর্ষা নেমেছে। আমার সর্ব্বশরীরে শ্রাবণ যেন থেকে থেকে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ছে। বর্ষা আমাকে অভিভূত ক'রে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে চোখ বুজে থেকে জগদীশ একসময় বললে, হেমন্তকে আগে তুই দেখিসনি, নয়?

জলে যেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে বললাম, দেখিনি তাই বাঁচোয়া, এখন পালাতে পারলে বাঁচি।

কেন রে?—জগদীশ একটু হাসল।

বললাম, ভয় করে ওকে দেখলে পাঠান মুলুকের মেয়ে, এদের সঙ্গে আমাদের খাপ খায় না।

কিন্তু রূপ?

রক্ষে করো ভাই। এমন মেয়ে দেখলে পৌরুষ আসে সঙ্কুচিত হয়ে।

হেমন্ত বড় ভালো মেয়ে রে!—বলে জগদীশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার চুপ ক'রে রইল। বলতে ইচ্ছা হোলো তোমার ভালো তোমার কাছেই থাক, আমাকে বিদায় দাও। কিন্তু কথাটা অত্যন্ত রূঢ় শোনাবে, তাই চুপ করে রইলাম।

মুখ বুজে কেবল মেয়েরাই এতকাল কাটিয়ে দিতে পারে, দেখছিস ত?—জগদীশ বলতে লাগল, আমারই মতো এক হতভাগ্যের হাতে ও পড়েছিল, সে ছোকরা সন্ন্যিসি হয়ে বেরিয়ে গেছে আজ সাত বছর।

এমন মেয়ের স্বামী সন্ন্যিসিই হয় জগদীশ। তুমি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা ক'রো না ভাই। তোমার ছেলের এই অসুখ, তার কথাই এখন ভাবো।

জগদীশ আর কোন কথা বললে না, বোধ হয় একটু আহত হয়েছে। স্নেহসিক্ত মন তার, তাই অভিমান বাজল। তার মতো মানুষের হৃদয়েও যে কোমলতা স্থান পায়, সেও যে এই বর্ষার গভীর রাত্রে ছেলে-মানুষের মতো সুলভ হৃদয়াবেগের প্রশ্রয় দেয় এজন্য আমি অধিকতর নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম। বললাম, অনেক আছে, অনেক আছে, এর চেয়ে অনেক বড় দুঃখ, বড় ব্যথা সংসারে রয়েছে। ভাতের জন্য কান্না আর ভালোবাসার জন্য কান্না, শুনে শুনে অরুচি ধরে গেছে। আর কি কিছু নেই কাঁদবার? সভ্য মানুষ আজো কাঁদবে অন্নক্ষুধা আর যৌবনক্ষুধা নিয়ে? একটা মেয়ের দেহভোগী একটা পুরুষ পালিয়ে

গেছে ব'লে তুমি—জগদীশ চক্রবর্ত্তী—তোমার মতো বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কাঁদবে তার সেই পাশবিক দুঃখে?

তা নয়। ব'লে জগদীশ এদিকে মুখ ফিরাল। বললে, তা নয়। কিন্তু একটা জীবন যে শুকিয়ে গেল তার সব সম্ভাবনা যে শুদ্ধ হয়ে গেল,—যাকে বলে, কুঁড়িতে বিনষ্ট হওয়া, নিরর্থক হবার দুঃখটা যাবে কোথা?

কে বলে এমন কথা? সন্তান হলেই সার্থক হোতো?

অনেকটা তাই, এই তাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে অন্য কথা। হেমন্তের গর্ভে হয়ত জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ জন্মাতে পারত। উপকৃত হতে পারত পৃথিবীর মানুষের সমাজ।

হয়ত পারত না, হয়ত আমাদের মতো অকর্ম্মণ্যর দল বাড়ত, কে জানে। কিন্তু হেমন্তের ব্যক্তিগত কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন? পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হতে পারলে না এ দুঃখ তার থাকবে কি জন্যে? তার সুমুখে কি বৃহৎ জীবন প'ড়ে নেই? বৃহত্তর মুক্তির পথ সে কি বেছে নিতে পারে না? চলে যে গেল তাকে হতভাগ্য বলে বর্ণনা করছ, কিন্তু এমনো হতে পারে ত, মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা নিয়ে সে-ছোকরা সংকীর্ণ সংসার থেকে মুক্তি নিয়ে গেছে? ও জগৎটার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই জগদীশ, সব পেয়েও মানুষ সর্ব্বত্যাগী হয় কেন, আত্মার সাধনায় কেন সে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে, কেন ছোটে অনির্ব্বাণ আলোর নেশায়, কেন মানুষ হয়ে অতিমানুষ হবার দুর্ব্বার যোগ-সাধনায় সে আত্মসমাহিত হয়, এ আমরা জানিনে।

গলার আওয়াজে সকাল বেলা ঘুম ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখি, হেমন্ত। ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠে বসলাম। পাশে জগদীশ নেই।

মশারিটা তোলা। হেমন্ত হেসে বললে, ধন্য ঘুম। পরের বাড়ী পেয়ে কি এমনি করেই নিশ্চিন্তে ঘুমোতে হয় সোমনাথবাবু?

ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আমি,—কিন্তু লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারলাম না।

হেমন্ত বললে, সকাল বেলা উঠে ট্রেণ ধরবার কথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন? কাল মণিব্যাগটা কোথায় রেখেছিলেন মনে পড়ে?

ব্যস্ত হয়ে বললাম, কেন আমার জামার পকেটে?

আজ্ঞে না মশাই, পড়েছিল সিঁড়ির ধারে, সকালবেলা কুড়িয়ে পেলুম। যাবার দিনে চেয়ে নেবেন।

আজ কি আমাদের যাওয়া হবে না?

বন্ধুর ছেলের এই অবস্থা দেখে যেতে মন উঠবে?

শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে বললাম, আমাদের মায়া দয়া বড় কম। হয়ত আমার আগে জগদীশই যেতে চাইবে। কোথায় গেল সে?

হেমন্ত বললে, তিনি এ গ্রামের জামাই। সকালবেলা নানা লোক এসে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

এরই মধ্যে হেমন্তর স্নান হয়ে গেছে। আজ সকালের আলোয় স্পষ্ট ক'রে তাকে দেখলাম। চুল সে বাঁধে না। কাল বাঁধেনি, আজও তার সেই রাশিকৃত চুল খোলা। চুলগুলি ভিজা কিন্তু রুক্ষ, কোথাও তার মধ্যে চিরুণীর দাগ নেই। মুখখানা বড়, বড় বড় চোখ, বড় নাক, বিস্তৃত ওষ্ঠাধর। সুন্দর ও দীর্ঘ তার দুখানা হাত, আঙুলগুলিও দীর্ঘ এবং ততোধিক সুন্দর।

রূপবর্ণনাটা করলাম মনে, মুখে বললাম, আপনি গেরুয়া রংয়ের কাপড় পরতে ভালোবাসেন? কালও দেখেছি, আজও—

হেমন্ত বললে, হ্যাঁ, আমার সব কাপড়ই এই। আসুন এখন, স্নান

ক'রে আসুন, কালাচাঁদ যাচ্ছে সঙ্গে। জলখাবার তৈরি হয়ে রয়েছে।

এত সকালে আমার স্নান করা অভ্যেস নেই কিন্তু।

সকাল? বেলা ন'টা বাজে যে। ও কথা বললে আমি শুনব না। ডেকে দিই কালাচাঁদকে।—এই ব'লে হেমন্ত বেরিয়ে চ'লে গেল।

কাপড় চোপড় আমরা সঙ্গে আনিনি কিন্তু কিছুরই অভাব ঘটল না। যথাসময়ে সবই হাতের কাছে পাওয়া গেল। মা পড়লেন পর্দ্দার আড়ালে, আজও তিনি এ বাড়ীর বউ, তাঁর উচ্চবাচ্য কম, আদর অভ্যর্থনা যা কিছু হেমন্তের হাতে। সে অতিরিক্ত স্পষ্ট। সবাই এসে তাকেই খোঁজে, সব ব্যবস্থার ভার তারই উপর। তার গলার আওয়াজটাই এ বাড়ীর সকলের কণ্ঠকে ছাপিয়ে ওঠে। অবাক হয়ে দেখলাম কোনো মুহূর্ত্তেই তার বিশ্রাম নেবার সময় নেই।

এক সময়ে আবার সে ঘরে এসে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবুর অবস্থাটা কেমন মনে হচ্ছে আজ?

হেমন্ত বললে, মন্দের দিকে যাচ্ছে না এটা বেশ বোঝা যায়। আপনার আর কি বলুন, মায়া দয়ার ত ধার ধারেন না।

গলার আওয়াজ তার মিষ্ট। সকলের চেয়ে ভালো লাগে, তার চোখে ও মুখে কোথাও ছলনা নেই। পুরুষের মনে কারণে ও অকারণে মোহ সঞ্চার করবার যে প্রকৃতি মেয়েদের ভাবভঙ্গিতে লক্ষ্য করা যায়, সে-বস্তু এর মধ্যে নেই। এর যে আবেদন সেটি সহজ সরলতার। কিন্তু একটি কারণে আমি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হচ্ছি। সে আমাকে খানিকটা নির্ব্বোধ ও স্নেহভাজন বলে ঠাউরে নিয়েছে। সে যেন অনেক বড় আমার চেয়ে। আমি যা বলি তাই সে সস্নেহে তাচ্ছিল্যের

সঙ্গে হাসিমুখে শোনে। যেন কোনো শিশুর কথা সে শুনছে। এটা বড় লাগে।

বললাম, ও কথাটায় যে আপনি দুঃখিত হবেন তা আমার মনে হয়নি। মায়া দয়া আর কেমন ক'রে থাকবে বলুন, আমাদের জীবন বড় দুঃখের।

তাই নাকি ?—হেমন্ত হেসে উঠ্‌ল, আপনার চেহারার কোথাও দুঃখের চিহ্ন নেই কিন্তু। বিয়ে করেছেন ?

স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। এমন অশোভন জবাব আমি প্রত্যাশা করিনি। এর কাছ থেকে সাহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করায় মনে মনে লজ্জিত হলাম। আমার দুঃখের এমন কদর্থ—এ কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভব। নিতান্ত সৌজন্যের অভাব ঘট্‌বে তাই উত্তর দিলাম, বিয়ে সবাই করে না।

বোধ হয় খানিকটা সময় তার হাতে ছিল। চৌকির উপর ব'সে এক একটি পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট প্রশ্নে সে আমার সমস্ত পরিচয় জেনে নিল। সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। এমন ভঙ্গীতে কথা বলিনি যাতে আমার কোনরূপ হৃদয়াবেগ প্রকাশ পায়। তবু বার দুই তার চোখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল সে হাসিতে বিদ্রূপ জড়ানো একপ্রকার শক্ত বাঁধনে তার মন বাঁধা, সেখানে উচ্ছ্বাসের ঠাঁই নেই।

এক সময় সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি খেতে বেশি ভালোবাসেন ?

আমি ? কেন বলুন ত ?

এমনি, জিজ্ঞাসা ক'রে রাখি। যা ভালো লাগে আপনার তাই খাওয়ানোই ত আমার কাজ।

হেসে বললাম, এমন বাধ্য বাধকতা ত থাকার কথা নয় !

আছে বৈ কি, আপনি যে আমাদের অতিথি। জামাইবাবুর কথা ছেড়ে দিন্, আপনার দেখা কি আর সচরাচর পাওয়া যাবে?

উত্তরটা ছিল খুব সহজ, কিন্তু আত্মসংযম করলাম। সুলভ আত্মীয়তা করাটা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নারীর এমন আগ্রহে পুরুষ খুসি হয়, তাদের আত্মাভিমান স্ফীত হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে বাধে স্ত্রীলোকের হৃদয়ের কাছে আতিথ্য নেওয়াটা। যা কিছু সাধারণ, যা কিছু চল্‌তি তার প্রতি আমার নিষ্ঠুর অবহেলা। যা আমার জানা, যা আমার বোধের মধ্যে আছে তারই একটা অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তি আমি নিজ জীবনে প্রতিফলিত দেখতে চাইনে। সংসারে বহু সংখ্যক হেমন্তর ইতিহাস আমার জানা আছে। এমনি তাদের কথা, এমনি হাসি, এমনি আগ্রহ আর চাল-চলন। চির-পুরাতনকে চাই চির নূতনের রূপে, অসাধারণ অভিনবত্বে তার আবির্ভাব হোক।

চুপ ক'রে আছি দেখে হেমন্ত বোধকরি একটু আহত হোলো। বললে, উত্তর দিলেন না যে? এখানে বুঝি আপনার ভালো লাগছে না?

বললাম, ভালো লাগছে কিনা বলা কঠিন। ভালো লাগবারো হয়ত কিছু নেই কিন্তু চ'লে গেলেও হয়ত ভালো লাগবে না।

হেমন্ত আমার হেঁয়ালি শুনে হাসল। বললে, কি রকমটি থাকতে পারলে আপনি খুসি হন্?

তাই কি জানি?

তবে আমিই জানবার চেষ্টা করব।—ব'লে হেমন্ত চলে গেল।

তুমি জানবার চেষ্টা করবে? মন উঠল হেসে। তুমি কে? আজ আছো কাল নেই! এই ক্ষণস্থায়ী আগ্রহ আর আতিথেয়তা,

এই মনভুলানো রঙিন মেঘ, এর মূল্য কি আমার জীবনে ? আমাকে তোমার এই সামান্য ভালো লাগাটুকু, এর জন্মবৃত্তান্ত ত জানি ! তুমি আমাকে চাওনা, একটি অবলম্বনকে মাত্র তোমার প্রয়োজন। প্রাণের ঐশ্বর্য্য রাখবার মতো পাত্র তোমার নেই, হায় কাঙালিনী, তুমি একটি উপলক্ষকে পেয়ে খুসি হয়ে উঠেছ।

কিন্তু এই ত জীবনের চেহারা ! এর চেয়ে কী বেশি আর পাওয়া যায়। সামান্য স্নেহ আর প্রীতি, সামান্য সেবা আর আগ্রহ মানুষ ত এই নিয়েই খুসি। আমি ? আমিও দুর্ব্বল। আমিও কোথায় যেন প্রত্যাশা ক'রে আছি, এই মেয়েটি আরো কিছু বলুক। আমার কানে ঢেলে দিক্ তার মধুরতম ভাষা, সুমুখে এসে দাঁড়াক্ তার মধুরতম রূপ নিয়ে। অসীম প্রত্যাশাই পুরুষের প্রকৃতি, অনন্ত আশা। কিছুই আমি চাইব না, যদি চাই সব চেয়ে বেশি চাইব। আমার বৈরাগ্য সন্ন্যাস নয়, দুরন্ত কামনার রূপান্তর। আজ তাই চোখ, কান, মন খুলে রেখে বসে আছি।

. এমন সময় জগদীশ এসে ঘরে ঢুক্‌ল। সজাগ হয়ে তার দিকে তাকালাম। হাতে পায়ে তার কর্ম্মব্যস্ততা। জামাটা খুলে সে বিছানায় ছুড়ে রাখ্‌ল। তারপর বললে, অনেক ভক্ত জুটে গেল গ্রামে, আমি যে জনপ্রিয় হতে পারি এ জানতুম না।

বললাম, কি রকম ?

দেখিয়ে দেবো বিকেলবেলা, আসবে সবাই। ওদের লাঞ্ছিত ক'রে ওদের খুসি করেছি। জেল্-ফেরতা মডার্ণ্ নেতা আমি। একটি ভক্ত চুপি চুপি বলেছে, টাকার একটা তোড়া আমাকে উপহার দেবে।

তুমি সব জায়গায় এমনি লোক ঠকিয়ে বেড়াতে চাও ? তোমাকে কী গুণে দেবে শুনি ?

গুণ ত নয়, কৃতিত্ব। কৃতিত্বের দাম। আর ঠকালুম কোথায় বল্, এ ত ভক্তের পূজা-নিবেদন। চুপ, তোকেও কিছু ভাগ দেবো।

চুপি চুপি তৎক্ষণাৎ বললাম, কত দেবে জগদীশদা?

পাঁচ টাকাও যদি পাই আড়াই টাকা তোর।

দেবে ত ঠিক?

মাইরি।

এমন সময় হেমন্ত এসে ঢুকল। বললে, আর দেরি নয়, এবার আসুন, ঠাঁই করা হয়েছে।

জগদীশ বললে, দাঁড়াও হেমন্ত, আচ্ছা বলো ত, 'এই ছোকরাকে তোমার ঠিক কেমন মনে হয়?

হেমন্ত কিয়ৎক্ষণ নীরবে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর হেসে বললে, আমিও তাই ভাবছি জামাইবাবু, আপনার সঙ্গে মেশেন কিনা এই যা ভয়।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। হেমন্ত পুনরায় বললে, এখন খাবেন আসুন, খাওয়া দাওয়ার পর ভালমন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাবে।

আমি আর জগদীশ তার অনুসরণ করলাম।

বড় একটা দালানে আসন পাতা রয়েছে। দুখানা বড় বড় থালায় আহারের অপরিমেয় উপকরণ দেখে মুখ দিয়ে আমাদের আর কথা সরল না। আয়োজন বটে। এই প্রকাণ্ড বনেদি পরিবারের সঙ্গে এই আয়োজনের একটি ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। আজ দালানের চারিদিকে জনতার জটলা দেখতে পাওয়া গেল এ বাড়ীতে আবালবৃদ্ধবনিতা এসে জড়ো হয়েছে। এতগুলো চোখের সুমুখে

আহার করতে হবে ভেবে থতিয়ে গেলাম। জগদীশের শাশুড়ী মাথায় ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে। তিনি এ বাড়ীর বউ।

পাশাপাশি দুজনে গিয়ে বসলাম। জগদীশ ফস ক'রে বললে, এ যে ফাঁসীর খাওয়া, করেছ কি হেমন্ত?—তার পর মুখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে বললে, এই ক্ষুধার্ত্ত জনতার জন্য প্রসাদ রাখতে হবে নাকি?

ওকি জামাইবাবু, ওঁরা যে সবাই আপনার গুরুজন।

ও, তা বটে। তাহলে ওঁরা আগে উচ্ছিষ্ট ক'রে দিন, আমরা প্রসাদ পাই।—তারপর আবার জগদীশ হেসে তাদের দিকে তাকাল,—সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এবার অনুমতি করুন, অন্নগ্রহণ করি।

বসুন, বসুন, বসো বাবা বসো, বসো হে—প্রভৃতি শব্দের ভিতর দিয়ে আমরা আচমন ক'রে ভাত নিয়ে বসলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বিদ্রূপেও তারা স্থানত্যাগ করলে না।

এই সময় একবারটি হেমন্তর সঙ্গে আমার চোখচোখি হোলো। হবামাত্র হেসে সে কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, ভয় কি, এই ত আমি আছি। লজ্জা ক'রে খেয়ো না ভাই, এ তোমার নিজের বাড়ী।

হাতখানা আমার অবশ হয়ে থেমে গেল। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। নিজের বাড়ী নয় একথা সেও জানে, কিন্তু ভিড়ের মাঝখানে সবাইকে শুনিয়ে আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার কে তাকে দিল? কোনোমতে আহারে প্রবৃত্ত হলাম বটে কিন্তু মনটা রি রি ক'রে জ্বলতে লাগল। একটিমাত্র কথায় সে আমাকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল। বড় হয়ে ওঠবার জন্য তাকে কষ্ট করতে হয় না, আমার চেয়ে সে দেখতে বড় একথা সবাই স্বীকার করবে। হ্যাঁ, সবাই স্বীকার করবে কিন্তু আমি নয়। বয়স তার আমার চেয়ে কম

এ আমি জানতে পেরেছি। শুধু কি তাই? আঘাত লাগে যে আত্মাভিমানে। আমার সঙ্গে তুলনায় আমারই চোখের সুমুখে কোনো স্ত্রীলোক বড় হয়ে উঠবে, শিক্ষিত পুরুষের মনের কাছে এ অসহ্য!

আবার আহারে বসলাম কিন্তু রুচি চ'লে গিয়েছিল। হেমন্ত আমাদের সুমুখে বসে আমাদেরই গায়ে বাতাস করছে। মাথার খোলা চুল তার মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে, চুলগুলি অনেকটা তাম্রবর্ণ। পরণে তেমনি গেরুয়া। আপন যৌবন সম্বন্ধে সে অবশ্যই সচেতন কিন্তু বিশেষভাবে নয়। যদি বা সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যায় তবে সে এমন কিছু লজ্জিত হবে না। প্রথমত আমাকে সে ছেলেমানুষ ব'লে ধরে নিয়েছে, দ্বিতীয়তঃ আমরা তার অনাত্মীয় নই। এতেও আমি আহত হই। পুরুষ ব'লে আমাকে সে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনবে না, একি স্পর্দ্ধা! আমার কাছে তার লজ্জা করবার কিছু কি নেই?

জগদীশ আপন মনে গিলছে। বাস্তবিক, ক্ষুধার চেহারা বোধ করি এমনিই। এমনি অন্ধ ও করুণ। জগদীশ বহুদিন এমন আনন্দে খেতে পায়নি। এই সময় আর একবার মুখ তুলে বললাম, থাক্ থাক্, আর বাতাস করবেন না।

করব না? মুখে যে রক্ত ফেটে পড়েছে! তুমি ভাই ভারি লাজুক! দেখো ত জামাইবাবুর কাণ্ডটা!

জগদীশ বললে, পাখী যখন খায় তখন ডাকে না। সত্যি, আহারের আনন্দ এমন অনেককাল পাইনি, স্বর্গীয় পিতার নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছি!

হেমন্ত হেসে উঠ্‌ল। শুদ্ধ ভাষাটা উপস্থিত যারা বুঝলো তারাও মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে হাসল। আমি তাকালাম হেমন্তর দিকে।

নিমেষমাত্র, কিন্তু একান্ত ক'রে আজ তার চোখ দুটি দেখতে পেলাম। কালো চোখ ? শরৎ শেষের আকাশ কি কালো ? এমনি গভীর চোখ ছিল আমার স্বপ্নে ! সে এত চঞ্চল, এত কর্ম্মব্যস্ত, কিন্তু কে বলে চোখের দৃষ্টিও তার অস্থির ? এমনি চোখের চিত্র আঁকা ছিল আমার প্রাণের পটে। হ্যাঁ, এমনি। কবে মনে মনে এই চিত্র এঁকে ছিলাম। জানিনে। হয়ত জনবহুল নগরীর কোনো এক প্রান্তে, হয়ত কোনো রেল ষ্টেশনে, নয়ত কোনো নদীর ধারে। আদর্শ সুন্দরীর একটা রূপ পুরুষের মন কল্পনা ক'রে রাখে। আমিও রেখেছিলাম; তারই একটা লক্ষণ নিয়ে গেছে হেমন্তর চোখে। সেই চোখের গভীরতম ভাষায় আমারই প্রাণের একটি সুদূরতম ঐক্য খুঁজে পেলাম।

আহারান্তে সেদিন জগদীশকে সবাই টানাটানি ক'রে নিয়ে গেল। আমি গিয়ে বসলাম বাবুর বিছানার পাশে। কপালে হাত দিয়ে তার জ্বর পরীক্ষা করলাম। ডাক্তার বলেছেন, একুশ দিনে জ্বর ছাড়বার সম্ভাবনা। তার আর দুদিনমাত্র বাকি। সেবা ও যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই।

ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে দিনগুলো কেমন ক'রে কাটছে। চ'লে যাবার তাগিদটা মন থেকে কিছু কমে গেছে, কিন্তু কেন ? এটা কিসের নেশা ? এই যে উন্মুখ কৌতুহল নিয়ে দরজার দিকে চেয়ে বসে রয়েছি, একি আমার নূতন রূপ ? আমি ভাবতে পারিনে, একান্ত নিঃসঙ্গ না হলে আমার মন কথা কয়না। যেমন নদী নেমে আসে নিম্নগামী পথে, কোরক যেমন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ফুল হয়ে ফোটে, সন্ধ্যার তারা যেমন আত্মপ্রকাশ করে স্বাভাবিক গতিতে, আমিও তেমনি। পিছনে আমার রয়েছে একটি অলক্ষ্য নিয়তি। বিচার করব, বিশ্লেষণ করব, সমালোচনা করব, কিন্তু

নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট পথে যেতে আমাকে হবেই। দাঁড়াবার উপায় নেই, বাধা দেবার সাধ্য নেই, মান্‌তে তাকে হবেই হবে।

দ্রুতপদে হেমন্ত এসে ঘরে ঢুকল। চমকে উঠি, ভয় পেয়ে যাই। ঘর কাঁপে তার পায়ে। সোজা হয়ে বসলাম। প্রথমে সে কথা কইল না, সময় ছিলনা কথা বলবার। দ্রুত সে থার্ম্মমিটারটা বা'র ক'রে ঝেড়ে বাবুর হাতের তলায় গুঁজে দিল, তারপর ওষুধ ঢেলে তার মুখের কাছে ধ'রে বললে, খাও ত বাবা, লক্ষীটি, খেয়ে ফেলো ত? তিন মিনিট দেরি হয়ে গেছে, আমার হুঁস ছিল না।

ওষুধ খাইয়ে সে বাবুর মুখ মুছিয়ে দিল।

বললাম, আপনাদের এখনো খাওয়া হলো না?

হলো বৈকি, পোড়া খাওয়ার জন্যেই ত এই দেরিটুকু হোয়ে গেল। এই যাবার সময় ছানার জল খাইয়ে গেছি।—এই ব'লে হাতের তলা থেকে থার্ম্মমিটারটা নিয়ে বললে, দেখুন ত কত জ্বর?

পরীক্ষা ক'রে বললাম, একশো পয়েণ্ট্ চার।

কমে গেছে!—ব'লে আনন্দে ও স্নেহে হেঁট হয়ে সে বাবুর মুখের উপর একটি মৃদু চুম্বন করল। তারপর নিশ্চিন্তে সোজা হয়ে উঠে বসে সে পুনরায় বললে ধন্য রাগী লোক আপনি। 'তুমি' ব'লে ডাকলে কি এত বড় অপরাধ হয়? কি ভাগ্যি যে লোকজনের মাঝখানে আমার পিঠে চড়চাপড়টা বসিয়ে দেননি?

হাসলাম। হেসে বললাম, লোকজনের মধ্যে 'তুমি' আর একলা থাকলে 'আপনি' এই বা কেমন?

একটা কারণ আছে পরে বল্‌ব। সবাইকে ত জানানো দরকার আপনি সত্যিই ছেলেমানুষ, নৈলে আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা, মেলামেশা···এটা পল্লীগ্রাম, বুঝতে পারছেন ত?

বললাম, না। এমন বঞ্চনা অসহ্য।

অসহ্য আপনার, আমাদের নয়। আমরা মেয়েমানুষ। আপনি দুদিন বাদে থাকবেন না, আমাকে চিরদিন বাস করতে হবে।

বললাম, আচ্ছা, আপনি গেরুয়া কাপড় পরেন কেন?

ভালো লাগে তাই।

এ ত' অদ্ভুত ভালো লাগা? মেয়েদের বৈরাগ্য কি কেউ বিশ্বাস করবে?

কেনই বা করবে? বৈরাগ্য ত আমার নেই।

কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। এই নীরবতাকে সেই ভাঙ্‌ল। বললে, আমার স্বামীর কথাটা আপনার জানবার ইচ্ছে, কেমন? আমারো জানাবার ইচ্ছে। তিনি এই গ্রামেরই ছেলে। ছোট থেকেই তিনি অন্য মেজাজের লোক ছিলেন। ধরে বেঁধে লোকে তাঁর বিয়ে দিলে। দিলে কি হবে, সংসার তাঁর সইল না। যাবার সময় তিনি আমাকে ব'লে গিয়েছেন, আমি তাঁকে বাধা দিইনি। বাধা দিয়ে সন্ন্যিসিকে আট্‌কানো যায় না।

কথার মধ্যে তার কোথাও দুঃখের সুর নেই। এ তার বিচার-বুদ্ধির কথা। এখানে সাহানুভুতি প্রকাশের চেষ্টাটা বিড়ম্বনা। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এমন ক'রে এঘরে বসে কথা বলাটা সঙ্গত নয়। বললাম, কালাচাঁদ কোথায়?

কেন, কিছু চাই আপনার?

একটু খাবার জল চাইতাম।

ধড়মড় ক'রে হেমন্ত উঠ্‌ল। হাত ধুয়ে পরিষ্কার কাঁচের গেলাসে জল আন্‌ল। হাত বাড়িয়ে জল নিতে গেলাম, হেসে সে হাত সরিয়ে নিল। বললাম, বারে, দিন?

না, দেবো না, আগে দিব্যি করুন ?

হঠাৎ যেন ভূত চাপলো তার মাথায়। চেহারাটা তার গেল বদ্‌লে। হেসে বললাম, কিসের দিব্যি ?

ব'লে দিতে হবে কিসের দিব্যি ? আচ্ছা, আচ্ছা বলেই দেবো,—উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল হেমন্তর মুখ, ঘাম ফেটে পড়ল তার কপাল বেয়ে, আগুনের আভার মতো সে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল,—চেষ্টা করলে আপনিও বুঝতে পারতেন।

অকস্মাৎ তার হাতটা ফসকে গেলাসটা মেঝের উপর পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল। জলে গেল বিছানাটা ভিজে। চম্‌কে জেগে উঠ্‌ল বাবু। আমরা পরস্পর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু সে কেবল একটি মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই ছুটে হেমন্ত বাবুর পাশে গিয়ে বসল। তার মুখে হাত বুলিয়ে বললে, ভয় কি বাবা, এই যে আমি... আপনি নিচে যান্, দিচ্ছি এখুনি আপনার খাবার জল। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছিল তার। সে হাসতে লাগল,—আমি নতমস্তকে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেলাম।

সারা বাড়ীটা যেন ভূমিকম্পে দুলছে। কোনোমতে নিচে নেমে এসে ঘরে ঢুকলাম। এমন আমার কখনো হয়নি, এ নতুন, এ অভিনব। নারীর যৌবন-চাঞ্চল্য আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু এই কি তাই ? অনেক চিন্তাই আমি জীবনে করেছি, অনেক অভিজ্ঞতার উপর দিয়ে ভেসে গিয়েছি, কিন্তু সত্য বলতে কি, স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা, প্রণয় ইত্যাদির কোনো চেহারা আমি কোনোদিন লক্ষ্য করিনি। আজ ধারণা কিয়ৎপরিমাণে বদলাতে হোলো। মানুষের সমস্ত জীবনকে চক্ষের নিমিষে ওলোটপালট করবার মতো এত বড়ো শক্তি আর নেই। তার হিতাহিতবুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক, আদর্শ, এমন

কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত এই বস্তুটি অবাধে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। এরই প্রভাবে দানব হয়, দেবতা হয়। পা কাঁপছে, প্রাণ কাঁপছে। আশ্চর্য্য, চোখ চেয়ে যা কিছু দেখছি সকলের ভিতর যেন একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন এসে গেছে। এই বাড়ীটা, ওই জান্‌লা, বাইরের গাছপালা, তাদের পিছনে শ্রাবণের মেঘময় দিন, সকলের চেহারা যেন আলাদা। আমি যেন নতুন ক'রে এদের ভিতর এসে পড়েছি। সব যেন আমার কাছে রহস্যময়, অপরিচিত, দুর্জ্জেয়।

কালাচাঁদ এসে দাঁড়াল, হাতে তার জলের গ্লাস। হাত কাঁপছে, তবু তার হাত থেকে জল নিলাম। সে বললে, আপনি একটু ঘুমোন, দিদিমণি ব'লে দিলেন। ওকি আপনার পায়ে...অত রক্ত, ইস, কেমন ক'রে কাটলেন?

তাইত, চেয়ে দেখি মেঝেয়, তক্তার উপরে, আমার পায়ে রক্ত ছড়াছড়ি। কালাচাঁদ দ্রুতপদে চলে গেল এবং তার এক মিনিট পরেই ঝড়ের মতো হেমন্ত এসে ঘরে ঢুকল।

কেমন ক'রে কাটল? দ্রুততায়—নিশ্বাসের তার বুক উঠা-নামা করছিল।

বললাম, বোধ হয় গ্লাসের কাঁচে। থাক্, ব্যস্ত হবেন না।

হেমন্ত কাছে ব'সে জোর ক'রে আমার একটা পা টেনে নিল এবং তার বাঁ হাতের চুড়ি থেকে একটা সেফ্‌টিপিন্ খুলে ছোট এক টুক্‌রো কাঁচ সেই পা থেকে নিবিষ্ট মনোযোগে খুঁটে বা'র করল। তারপর শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা সুরু হোলো, সে-চিকিৎসার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রক্রিয়াগুলি যে-কোনো অবিবাহিত যুবকের কাছে লোভনীয়। এতক্ষণে সহজ ক'রে হাসতে পারলাম। বললাম, আমার এই রক্তপাতের জন্য আপনার উত্তেজনাটা দায়ি, একথা মানবেন ত?

মুখখানি সে নিচু ক'রে রইল, সে-মুখ করুণ আর দুঃখিত। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন।

ক্ষমা আমি করব না, শাস্তিই দেবো। আপনার পরণের কাপড় ছিঁড়ে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিন্।

দিতে গেলে ত বাধাই দেবেন। ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে সে তাকাল। আরো যেন কিছু তার বলবার ছিল কিন্তু নীরবে হেসে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব'সে ব'সে আপন বক্ষস্পন্দন শুন্‌তে পাচ্ছি। পৃথিবীর সব মানুষ এই মুহূর্ত্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একা আমি জাগ্রত, কোথাও এখন আমার মধ্যে নিদ্রা নেই, রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎসব জ্ব'লে উঠেছে, সব তন্ত্রী উঠেছে বেজে, শব্দের ঝঞ্চনায় প্রবল কোলাহলে মন উঠেছে মেতে। এই বিশেষ একটা মুহূর্ত্ত আমার সমস্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, এই মুহূর্ত্তটির জন্য এত আয়োজন, এত উদ্বেগ আর কৌতূহল। এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা।

মন রয়েছে সচেতন। চক্ষের নিমেষে এই চিত্তচাঞ্চল্যকে জয় করতে পারি, আমি অন্ধ নয়। দুর্নীতির চেহারাটা জানি, জানি তথাকথিত প্রেমের প্রকৃতিটা। আপন ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে আমার নির্লিপ্ত মানসচক্ষু জেগে রয়েছে, রাশ কতটুকু আল্‌গা হয়েছে আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে, কিন্তু আপন চিত্তের এমন অনির্ব্বচনীয় আলেখ্য এর আগে ত দেখিনি! এটা প্রেম নয়, এ যৌবনের রঙ। কে জান্‌ত আমার ভিতরে ছিল এত রঙ, এত রূপ, এত সঙ্গীত! আমার দেহে অদ্ভুত এক জ্যোতি, অদ্ভুত একটা আভা, অদ্ভুত আলো। প্রাণের উদয়াচলে যেন সোনার বর্ণ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে! হ্যাঁ জানি প্রেমের তথাকথিত চেহারা। শুধু প্রেম, সে উন্মার্গগামীর জন্য, সেটা যোগী-তপস্বীর স্বপ্ন তার মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে, কিন্তু আত্মহারা

আবেশ নেই। শুধু প্রেম নয়, শুধু দেহ নয়, দুইয়ের সংমিশ্রিত রূপ, সে-রূপের তীর্থসঙ্গম যৌবনে। নীতি বড় নয়, রুচি বড়, সৌন্দর্য্য বড়। দুর্নীতির প্রশ্ন নয়, পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন।

শাদা পরিষ্কার কাপড়ের টুক্‌রো ও এক বাল্‌তি জল নিয়ে হেমন্ত আবার ঘরে ঢুক্‌ল। তাকাল সে আমার দিকে। কী দেখ্‌লে সে আমার অনিমেষ চক্ষুতারকায়? তার নিজেরই ছায়া? কাছে এল, বসল মেঝের উপর, সযত্নে টেনে নিল আমার পা, বাঁধতে লাগল কাপড়ের টুক্‌রোটা। কী যেন প্রশ্ন করলে সে। সাড়া দিলাম না। আমি অবশ, অচেতন, পাথর, বরফ। কী উত্তর দেবো? প্রশ্ন শুনলাম, তাকে অনুভব করলাম। তার চোখ, মুখ, আঙুল, সব যেন কথা কইছে। উত্তর না পেয়ে সে উঠ্‌ল। বাল্‌তির জল নিয়ে ঘরের ভিতরকার রক্তের চিহ্নগুলি ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে দিল।

হঠাৎ মনে পড়ল এমন অক্লান্ত সেবা জীবনে পাইনি, এমন আন্তরিক, এমন প্রাণময়। অনন্তকাল ধ'রে এই মেয়েটি যেন নিঃশব্দে আমার সেবা ক'রে চলেছে; আহার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, আগ্রহ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে আমাকে যেন পরিপ্লাবিত করেছে, আমাকে মূল্যবান করেছে, গৌরবান্বিত করেছে! এমন আপন জন, এমন আত্মীয়, এমন বন্ধু আর কেউ নেই।

এমন কি জমা হয়ে আছে আমার পরমায়ুর পাতায়? কিছু না। কিছু পাইনি। শৈশবে মাতৃহীন। পিতার বাৎসল্য অভিশপ্ত। গ্রাম বিমুখ। আর যা কিছু সব মৌখিক, বোঝাপড়া, চুক্তি, বিনিময়! ভঙ্গুর কোনো কোনো সম্পর্ক আছে কারো কারো সঙ্গে, পরীক্ষায় তা টিঁক্‌বে না। ব্যথায় টন্‌টন ক'রে উঠ্‌ল বুক। কাঙাল যখন রাজৈশ্বর্য্য পায়, চোখ ফেটে তার কান্না আসে। কিছু পাইনি জীবনে, কিছুই ছিল না,

হা হা ক'রে মরেছি। আজ মনে হচ্ছে তৃষ্ণায়-তৃষ্ণায় আমার বঞ্চিত আত্মা জ্বলে-পুড়ে গেছে। আদর্শবাদী নই, বাস্তবী নই, অত্যন্ত সাধারণ মানুষ আমি। শূন্যকে নিয়ে এতদিন কাটিয়েছি, শূন্যে উড়িয়েছি মন চিত্ত নিয়ে বিলাস করেছি। কত সান্ত্বনা, কত প্রলেপ, কত আবরণ—সমস্ত বিদীর্ণ ক'রে আমার বিদ্রোহী আত্মা চোখে মুখে কণ্ঠে বক্ষের স্পন্দনে নিজেকে প্রকাশ করছে নিজেকে মুক্তি দিতে চাইছে।

কাছে এসে হেমন্ত দাঁড়াল। কাছে এলে একটি অপূর্ব্ব আনন্দে শরীর রোমাঞ্চ হয়। গন্ধ—একটি গন্ধ আছে তাকে ঘিরে, যেমন গন্ধ আছে বনপথের উদাসী বাতাসে, যেমন গন্ধ জ্যোৎস্নায়, যেমন গন্ধ পরিশ্রান্ত পথিকের দিবাস্বপ্নে। বললে, আপনাকে হয়ত বিরক্তই করছি।

একি তার কণ্ঠস্বর! সে যেন জলে ডুবে গেছে প্রাণপণ চেষ্টাতেও তার গলার আওয়াজ বেরুচ্ছে না, স্বর ভেঙে পড়েছে। কাঁপছে তার গলা, কাঁপছে চোখ। পুনরায় বললে, বাবুর জ্বর আজ ছেড়েছে, মা শোবেন তাঁর কাছে। জামাইবাবু যাবেন বিষ্ণুপুরে, কাল ডাক্তার নিয়ে ফিরবেন।

আরো নিচে নেমেছে তার কণ্ঠ, আরো অস্পষ্ট। কিন্তু তার বক্তব্যটা অনুভব ক'রে এতক্ষণ পরে আমি কথা বললাম,—রাত্রে একলা থাকব এ ঘরে, ভুতের ভয় নেই ত?

যদি থাকেই, ভয় পাবেন কেন পুরুষ মানুষ হয়ে? কই, আমি ত ভয় পাইনে!—ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দিন চারেক পরে মা'র চিঠি এল। হেমন্তর হাত থেকে নিয়ে জগদীশ খুলে পড়ল। তার নামেই চিঠি। মা লিখেছেন, বাবু ভালো হয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। তার অন্নপথ্য করার পর তুমি যদি নিতান্তই না আসতে পার সোমনাথকে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি বোধহয় শীঘ্রই বিদেশে যাবো। ছেলেমেয়েরা ভালো আছে। ভগবতীর চাকরি হয়েছে। লোকনাথের কোনো খবর নেই। প্রিয়ম্বদা ইতিমধ্যে একদিন লোক পাঠিয়েছিলেন তোমার খবর নেবার জন্য। আশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি তোমাদের মা।

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করল, প্রিয়ম্বদা কে জামাই বাবু?

জগদীশ বললে, তিনি বর্ত্তমান বাংলার দেশপূজ্যা নেত্রী।

কই, নাম শুনিনি ত?

ঠিক সময়ে পাবে শুনতে। তোমাদের এই হতভাগ্য গণ্ডগ্রামে তাঁর আলো এখনো এসে পৌঁছয়নি।

কেমন মানুষ তিনি?

একালের ঠিক উপযোগী। শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং বয়সে নবীনা। তোমরা তাঁর বাঁ-পায়ের নখের যোগ্য নও।

হেমন্ত হেসে বললে, আপনি কি তাঁর মতবাদের প্রচারক?

রক্ষে করো ভাই, তাঁর মতবাদ কিছু নেই তাই বাঁচোয়া। তিনি কেবল চান্ স্বাধীনতা। এ নাকি তাঁর জন্মগত অধিকার।

হেমন্ত কি যেন চিন্তা করল। তারপর বললে, পরের বুলি আউড়ে বাহাদুরি কেবল মেয়েরাই নেয়। এবার তাঁকে বুঝতে পেরেছি। যাক্‌গে কিন্তু আপনার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক জামাইবাবু?

জগদীশ দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রিয়ম্বদার উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বললে, আমি তাঁর একজন অনুগত ভক্ত, হেমন্ত।

বিস্ময় প্রকাশ ক'রে হেমন্ত একবার আমার দিকে তাকাল, এবং তারপর জগদীশের দিকে চেয়ে বললে আপনি ভক্ত তাঁর!

কেন?

কেন-র কৈফিয়ৎ আছে বিজ্ঞান শাস্ত্রে। কিন্তু আমি তাঁর রাঙাপাড় শাড়ী আর রাঙা দুখানি চরণের একনিষ্ঠ পূজারী!

আপনিও কি তাঁর ভক্ত সোমনাথবাবু?

বললাম, উত্তরটা লোকনাথ দিতে পারত, আমি নয়। তিনি আমার বৌদিদি, আমি তাঁকে মান্য করি।

জগদীশ বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। হেমন্ত আমার দিকে ফিরে হেসে বললে, জামাইবাবুর কথাটা বোঝা গেলনা, উনি প্রিয়ম্বদার ভক্ত, না প্রিয়ম্বদাই ওঁর ভক্ত এ সন্দেহটা রয়েই গেল আমার মনে।

জগদীশও হেসে উঠ্‌ল,—এক হাতে কি তালি বাজে হেমন্ত?

হেমন্ত আমার দিকে চেয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিছানার ধারেই আমি বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আমাদের যাওয়া ঠিক করলে কখন্।

জগদীশ বললে, ছেলে ত অন্নপথ্য করেছে, কাল কি পরশু যাই চল্?

কাল, না পরশু?

হেমন্তের কল্যাণে আহারাদিটা ভালই চলছিল, যেতে আর ইচ্ছে নেই। এমন খাওয়া অনেকদিন খাইনি রে।

তোমার শ্বশুরবাড়ী তোমার ভালো লাগছে, আমার কিন্তু অনেক কাজ জগদীশদা।

কিন্তু তোরও ত ভাল লাগার কথা ?

কেন ?

নিজের প্রশ্নটাই নিজের কানে বেয়াড়া শোনাল, মন প্রতিবাদ ক'রে উঠ্ল। জগদীশ মুখ ফিরিয়ে শুয়ে বললে, আমাকে এমন নির্বোধ মনে করিস কেন ? আমি ত তোর জন্যেই রয়েছি নৈলে অনেক আগেই চ'লে যেতাম।

অর্থাৎ হেমন্তের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তার আর অবিদিত নেই। এইটেই আমাকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ক'রে তুল্ল। বললাম, আমার জন্যেই যদি থাকতে হয় তবে চলো আজকেই বেরিয়ে পড়ি। মানসিক বিকারকে আমি প্রশ্রয় দিইনে।

মুখ তুলতেই দেখা গেল দরজার কাছে হেমন্ত দাঁড়িয়ে, আমার নিষ্ঠুর উক্তি দুই কান ভ'রে সে শুনেছে। হাতে ছিল তার দুই পেয়ালা চা। আমার দিকে বিমূঢ়ের মতো সে একবার তাকাল, তারপর নিঃশব্দে পেয়ালা দুটি এনে কাছে রেখে সে যখন স'রে দাঁড়াল, মনে হোলো আমি যেন তার সমস্ত আতিথেয়তাকে অপমানিত করেছি। বেশ করেছি। অধিকতর ক্রুদ্ধকণ্ঠে নির্দ্দয়ভাবে পুনরায় বললাম, মানুষের কাছে কিছু আশা করা অত্যন্ত অন্যায়, তারা কী দিতে পারে ? সংসারে আত্মীয়তার কি কোনো দাম আছে জগদীশদা?

উত্তরটা কারো কাছেই শুন্তে পাওয়া গেল না, আমি যেন আরো হাল্কা হয়ে গেলাম। নিজের সম্ভ্রমটা হঠাৎ যেন নিজের কাছেই বিপন্ন হোলো। কিন্তু পাছে আরো কিছু বেফাঁস বেরিয়ে পড়ে এজন্য ভয়ে-ভয়েই চুপ ক'রে রইলাম। সেই নীরবতাকে ভঙ্গ করলে হেমন্ত। বললে, আজকেই কি তবে যাওয়া ঠিক করলেন জামাইবাবু ?

জান্‌লার বাইরে মেঘমেদুর অপরাহ্ণের দিকে একবার চেয়ে জগদীশ বললে, তাই ত ভাবছি, তুমি কি বলো ?

বলতে যে আর ভরসা পাইনে। অসুবিধে হ'লে কেমনই বা থাকবেন ? তা ছাড়া মা দিয়েছেন চিঠি।

অসুবিধে যে হচ্ছে না একথা আমিও জানি, সোমনাথ আরো বেশী জানে। হ্যাঁ, মা'র চিঠি। আজ না গিয়ে যদি কাল যাই তবে মাতৃস্নেহ কিছু কম্‌বে না এটা নিশ্চয়।

কিয়ৎক্ষণ জগদীশ চুপ ক'রে রইল তারপর তার স্বাভাবিক লঘুকণ্ঠে বললে, পুরুষ মানুষ কেবল বিশ্বাসঘাতক নয়, অকৃতজ্ঞ। এই ছোক্‌রার যে স্বাস্থ্যও ফিরে গেল একথা এ যাবার সময় কিন্তু স্বীকার ক'রে যাবে না।

বললাম, আমার কাজ রয়েছে জগদীশদা।

তবে কি এই বৃষ্টিতে এখনই বেরোতে চাস ?

চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিলাম। এবং এমন করেই ব'সে গেলাম যে তাড়াতাড়ি যাবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেল না। কোথাও কোনো কাজই আমার নেই, কোনো কাজেই মন ব্যস্ত নয়। এই খেলা শেষ হয়ে গেলে জানিনে আবার কোন্ খেলায় মাতবো। গত কয়দিনের ইতিহাস সোনার অক্ষরে একটু একটু করে লিখেছি, অমৃত রসে অভিষিক্ত হয়েছে আমার হৃদয়। যা পেয়েছি তা সহজে অল্প দিনেই পাওয়া, কিন্তু এইটুকু পেতেই ত শুনি অনেকে আজীবন তপস্যায় বসে। নিজেকে কোথাও কোথাও প্রশ্রয় দিয়েছি, কৌতুকের খেলা খেলেছি আপনার সঙ্গে, কৌতূহলের রসে মন উঠেছিল মেতে, তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয় দুলেছিল ক্ষণে ক্ষণে।

হেমন্তের মুখে আর হাসি ছিল না, থাকার কথাও নয়. তার

নির্ব্বাক্ এবং নির্লিপ্ত মুখে কোনো নালিশ নেই। অপ্রত্যাশিত অসম্মানের খোঁচায় তার সমস্ত যত্ন ও সেবা যেন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেখানে সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস, সেইখানেই সব চেয়ে বড় আঘাত। ঠিক জানি চোখে তার জল এসে পড়েছে। চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললাম, বাস্তবিক কাজ থাকলেই যে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে এই বা কে বললে জগদীশদা ? মা যেতে লিখেছেন ? বেশ ত, বাবু এখনো অন্নপথ্য করেনি এই কথা জানিয়ে একখানা কার্ড লিখে দিলেই ত হয়।

মা'র কাছে মিথ্যে বলার চেয়ে আমি বলি কালকেই আপনারা চ'লে যান্ জামাইবাবু।—এই ব'লে হেমন্ত চ'লে গেল।

জগদীশ ঘাড় ফিরিয়ে তার শ্যালিকার পথের দিকে চেয়ে একটু হাসল। হাসিটা তার করুণ স্নেহে সিক্ত। বললে, চিরদিন সোজা পথেই যে হাঁটে, বাঁকা পথ দেখালে তার মন বিরূপ হয়ে ওঠে, এমন কাজ করিসনে সোমনাথ !

. তার কথার উত্তর আমার মুখে ছিল না। কিন্তু আমি ত আগন্তুক, অতিথি, এমন পক্ষপাত আমার ভাল লাগল না। বললাম তুমি ত বলবেই জগদীশদা, তোমার শালী। তবুও তোমার কথা তোমাকেই বলি, জীবনের পথ সোজা নয়।

জগদীশ বহুক্ষণ নীরবে রইল, আমিও তার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইলাম। এক সময়ে সে বললে মান-অভিমানের পালায় সাক্ষী থাকতে আমার ভালই লাগে, কিন্তু আমার মনে হয় হেমন্তকে তুই চিনতে পারিসনি সোমনাথ !

কণ্ঠ নীরব কিন্তু মন প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌ল। চিন্‌তে আমি পেরেছি। চিনেছি বলেই ত এত আঘাত, এত প্রতিঘাত। পরমাত্মীয়

ব'লে জেনেছি তাই ত এই পরম অবহেলা। আত্মার সঙ্গে আত্মার পরিচয় ঘটেছে তাই ভয় হয়েছে পাছে বন্ধন স্বীকার করতে হয়। যা পাওয়া যায় তাই চিরস্থায়ী ক'রে ভোগ করা, এত বড় বন্ধনকে মন মানতে চায় না। আঘাত করিনি হেমন্তকে, করেছি নিজেকে, সেই আঘাতে আপনাকে ছিন্ন ক'রে দূরে নিক্ষেপ ক'রে দেবো। ভাসিয়ে দেবো কালের অক্লান্ত স্রোত প্রবাহে। কেবল গতি, কেবল ছুটে চলা, অশ্রান্ত ও অতৃপ্ত।

সন্ধ্যাটা এমনি করেই কাট্‌ল। বাহিরে খানিকটা ঘোরাফেরা ক'রে এসে আবার জগদীশের পাশে বসলাম। ঘরে আলো দিয়ে গেছে। জগদীশ তেমনি করেই পড়েছিল, কোন সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু একবার ডাকতেই তার সাড়া পাওয়া গেল! এটা তার অভ্যাস, নিঃশব্দে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে প'ড়ে থাকতে পারে।

বললাম, এবার ফিরে গিয়ে কি করা যায় বলো ত?

কিছু করব এই বা কেন ভাবছিস?

কিন্তু কিছু একটা ত করতে হবে। এমন ক'রে আর কতদিন?

চাকৃরি করবি?

মুরুব্বি নেই, চাকৃরি দেবে কে?

ব্যবসা।

তার মূলধন দরকার। কে দেবে?

জগদীশ বললে, আমি কিছুই করব না, এমনি করেই দিন কাটিয়ে দেবো। মাঝে মাঝে কিনৃব লটারির টিকিট, মাঝে মাঝে, হাত দেখাবো জ্যোতিষীকে, দিন বেশ কেটে যাবে।

কিন্তু ভাত-কাপড়ের ভাবনাটা? আশ্রয়?

তখন আছেন প্রিয়ম্বদা।

স্ত্রীলোকের অনুগ্রহ নেবে? সম্মানে ঘা লাগবে না?

লাগলেও সহ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু লোকনাথ শম্ভু প্রভাত—এদের উপায়? না জগদীশ, তার চেয়ে এসো আমরা নতুন ক'রে সব আরম্ভ করি। আমাদের কিসের অভাব? শক্তি স্বাস্থ্য অধ্যবসায়, কি নেই? প্রথমে খুঁজে দেখি ত্রুটি কোথায়। জান্‌বার চেষ্টা করা যাক্, সত্যি অপরাধটা কা'র! আমরা পদদলিত হয়ে আছি কাদের জন্যে! সংসারে এসে সামান্য অন্ন-সংস্থান করতে পারছিনে কাদের স্বার্থপরতায়। আমাদেরই অসংখ্য দুঃস্থ ভাই বোন বার বার মাথা তুল্‌তে গিয়ে বারে বারে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হচ্ছে কাদের অন্যায়ে—এসো একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক্।

তারপর?

তারপর কিছু নয়। সকলে মিলে একটা দল গড়া যাক্। তুমি, লোকনাথ, মা, শম্ভু, প্রিয়ম্বদা, প্রভাত, বঙ্কিম, ভগবতী এবং আর যাদের হাতের কাছে পাবো তাদের নিয়ে এসো আমরা একটা নতুন উপনিবেশ তৈরি করি। আমাদের চেয়ে দেখতে দাও আমরা ঠিক কোথায় আছি।

তারপর? ক্ষুধার অন্ন?

এই থেকেই হবে। সবাই মিলে পরিশ্রম করব, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকবে না, সব কাজ সকলে ভাগ ক'রে নেবো, সকলের মজুরি সমান, একটা বিরাট পরিবারের আমরা হবো সমান অংশীদার। তুমি কি মনে করো ক্ষুধার অন্ন কখনো ভিক্ষায় মেলে? তুমি কি ভাবো অনুগ্রহ নিলেই জীবনের সব কিছু পাওয়া হয়ে গেল? প্রিয়ম্বদা কি তোমায় চিরদিন সুনজরে দেখবেন? স্ত্রীলোকের চরিত্র কি তুমি এখনো জান্‌তে পারোনি?

জগদীশ হেসে বললে, তুই নিজে কি জেনেছিস ?

জানতে পারিনে তাই ত ভয় করে। কেবলই সন্তর্পণে হাঁটি পাছে চোরাবালির ওপর পা পড়ে। তাদের জানতে জানতেই হয়ত আয়ু শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সত্যি ক'রে জানতে হয়ত এ জীবনে পারব না। কিন্তু এ জানার চেয়েও বড় জানা আছে। চলো জগদীশদা, আমরা সেই প্রশ্নের গভীর উত্তরের সন্ধান করিগে। জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা, বিপুল তার ভবিষ্যৎ, এমনই কি একে শেষ হতে দেবো ?

জগদীশ বললে, কিন্তু অত আশা করচিস কিসের আশায় ? কি পাবি ?

পাবোনা কিছুই কিন্তু দিতে ত পারব ? শক্তি দেবো, দেবো স্বাস্থ্য, দেবো পরিশ্রম। চলো, গঠনের দিকে মন দেওয়া যাক্। পদদলিতের দল নিয়ে একবার কাজে নেমে দেখি, একবার দেখি এদের মেরুদণ্ডকে সোজা ক'রে দাঁড় করানো যায় কিনা। তুমি ত সংগ্রামে নেমেছিলে, কিন্তু সত্যি পরাধীন যে আমরা নিজেদেরই অন্দর মহলে। অজ্ঞান আর অশিক্ষার বোঝায় প্রাণ যে কণ্ঠাগত হোলো। অপরের কাছে মুক্তি ভিক্ষা করতে মানুষের মুক্তির পথ যে অবরুদ্ধ হয়ে এল !

তোর লক্ষ্যটা কি বল্ ত ?

আমার লক্ষ্য, এই জীবনধারাকে ত্যাগ করা। আমরা নবীন, আমরা গড়ব নতুন শাস্ত্র আর ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের গতি মানুষের পথ দিয়ে। এই শহরসভ্যতাকে ত্যাগ করো, এই যন্ত্রের যন্ত্রণা থেকে নিজেকে অব্যাহতি দাও—

তারপর ?

ফিরে চলো দেশের দুর্গম অন্ধকারের দিকে, সেই আমাদের পথ,

সেই আমাদের কাজ। নতুন সমাজ তৈরী করবো চলো, আসবে নতুন মানুষ, তারা নতুন পন্থায়।

অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, মশা কচুরিপানা—জগদীশ হেসে বললে, জঙ্গল পরিস্কার করা, চাষবাসে মন দেওয়া,—এই ত? সেই পুরনো কথা আর প্রাচীন বুলি! থাম্ সোমনাথ, আর জ্বালাসনে। কচুরিপানা আর ম্যালেরিয়া, ওদের অনেক ভাড়াটে সংস্কারক পাওয়া যাবে, ও কাজের লোক আলাদা। আমরা ত্যাগ ক'রে যাবো শহরকে? ফিরে যাবো বর্ত্তমান থেকে অতীতের দিকে?

বললাম, ভুল বুঝোনা জগদীশদা। আমি বলছি মাটির সঙ্গে সংস্পর্শ রাখতে, যে-মাটিতে আমরা আমাদের সোনার স্বপন বুনব। শহর ত্যাগ ক'রে যাবো শহরই গড়তে। কিন্তু সে হবে আদর্শ শহর। যন্ত্রকে রাখ্‌বে পায়ের তলায়, তার ঔদ্ধত্যকে মাথায় উঠতে দেবো না। আমরা হবো কর্ত্তা সে হবে কর্ম্ম—বুঝতে পেরেছ?

আমরা উভয়ে নীরব হয়ে রইলাম। এই আলোচনাটাই আমাদের জীবনে ইদানীং সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে সমস্যাটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে, সেটা প্রধানত জীবনধারণের। সুখের মধ্যে বাঁচা নয়, সহজ হয়ে বাঁচা। ক্ষুধার অন্ন দিয়ে দেহকে বাঁচানো যায়, কিন্তু প্রাণ কেবলমাত্র অন্নে বাঁচে না, তার ধর্ম্ম আলাদা। আমাদের ভিতরে রয়েছে একটা ভাঙনের সুর, একটা সামাজিক বিপ্লবের ইসারা, একটা আমূল সংস্কারের ইঙ্গিত,—সুসঙ্গতিপূর্ণ কোনো গঠনের কাজ আমাদের দ্বারা হয়ত সম্ভব নয়। এটা জগদীশ জানে। সে জানে পাপ জমেছে চারিদিকে, আকণ্ঠ গ্লানি আর গরল, সে বোঝেনা আপোষ, বোঝেনা জোড়াতালি। তার হৃদয়ে আছে সেই বৃহৎ কল্যাণবোধ, বহু মানবের প্রতি শুভ

কামনা। অন্যায় অসত্য এবং পাপের মূলোচ্ছেদ ক'রে নূতন স্বাস্থ্য আন্‌বে দেশের মানব-সমাজে, নব ধর্ম্মরাজ্য গ'ড়ে তুলবে। আমাদের স্বপ্ন আছে, শক্তি নেই, সাধ আছে, নেই সাধ্য—তাই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের ব্যাকুল দৃষ্টি আমাদের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা।

জগদীশ নীরবেই রইল, আমি উঠে বাইরে এলাম। আজ সমস্ত দিন ছিল ঘন বর্ষার আয়োজন, কিন্তু রাত্রে এখন আর মেঘ নেই, আকাশের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় তারা উঠেছে। ভিজা হাওয়া মুখে চোখে লাগছে, তার সঙ্গে জড়ানো কেয়াফুলের মুখচোরা গন্ধ। গাছের পত্র-পল্লবের ভিতরে বাতাসের দোলার সঙ্গে বৃষ্টিবিন্দুর এক একবার শব্দ হচ্ছে। স্বচ্ছ আকাশ অনেক দিন পরে দেখে চোখ খুসিতে ভ'রে উঠ্‌ল। প্রায় পনেরো দিন কাট্‌ল, অন্ন এবং আশ্রয়ের চিন্তা ছিল না তাই নিজের সঙ্গে মুখোমুখি বসে খানিকটা পরিচয় করতে পেরেছি। অন্ন সংগ্রামের জন্য আমাদের হৃদয় গেছে শুকিয়ে, কোনো উদার আদর্শের পথ ধ'রে চলার আর আমাদের উপায় নেই, সময় নেই কোনো বৃহৎ ভাবকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার,—সেইটুকু অবকাশ আমরা উদরের ক্ষুধার জন্য ব্যয় করব। আমরা মধ্যবিত্ত ওজনকরা সংস্থান নিয়ে কায়ক্লেশে আমাদের দিনযাপনে ব্যস্ত থাকতে হয়। দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্ত্রী, উপবাসী সন্তান, অভাবপন্ন সংসার, দরিদ্র সমাজ—এদের অতিক্রম ক'রে আমাদের আর কিছু নেই। আমরা অন্ধ, বর্ব্বর। বাঁচতে পারলেই নিশ্চিন্ত, মরতে পারলেই আনন্দ। আমার খুসির চোখ ক্লান্তিতে ভরে এল।

পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালাম। বললাম, কে, হেমন্ত?

হ্যাঁ, খাবার কি বাইরের ঘরে আনিয়ে দেবো?—ব'লে হেমন্ত ঠিক যেন কর্ত্তব্যপরায়ণা দাসীর মতো কুণ্ঠায় সরে দাঁড়াল।

বললাম, কাল সকালে আমরা চ'লে যাচ্ছি হেমন্ত।

হেমন্ত বললে তাই ত শুনলাম।

তোমার কি কিছু বলবার নেই ?

না। বলবার আর কি থাকতে পারে বলুন ?

নীরব হয়ে গেলাম। কিন্তু এমন ভাবে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা শোভন নয়, সম্ভবত এই কথা স্মরণ ক'রে হেমন্ত পুনরায় বললে, তবে এখানেই খাবার এনে দিই আপনার ?

বললাম, আমি কাঙাল নই হেমন্ত যে, রাতদিন খাবার কথাতেই খুসি থাক্‌ব। খাবার জন্যে তোমাদের বাড়ীতে আমি আসিনি।

হেমন্ত মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বললাম, যে অপরাধ তোমার প্রতি করেছি তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইব না হেমন্ত—

মৃদুকণ্ঠে হেমন্ত বললে, সে কথা আমি ত বলিনি আপনাকে ?

বলনি কিন্তু আমার কথাটাও তোমাকে শুনতে হবে। তুমি বুঝবে আমার মনের চেহারা, আমার চিত্তের দাহ। তোমার বাড়ীতে এসে যদি তোমাকেই অপমান ক'রে থাকি তবে ছোট হয়েছি আমি, তুমি নয়। তুমি কি মনে করো আমরা খুব ভদ্র ? চেয়ে ছাখো ত আমাদের জীবনের দিকে ? তুমি সবই শুনেছ, সবই জানতে পেরেছ। আমরা কোথায় নেমে এসেছি বলো ত ? মাঝে মাঝে আত্মবিদ্রোহে মন তিক্ত হয়ে ওঠে, তখন কোনো ভালোবাসারই আর অর্থ খুঁজে পাইনে। যাদের নিয়ে জীবনের দুঃখটা কাটিয়ে দেবো, ভাবি, তারা কোথায় আছে দাঁড়িয়ে ? জগদীশ সহায়-সম্পদ-শূন্য, লোকনাথ সমাজচ্যুত, শম্ভু-প্রভাত নিরাশ্রয়, গণপতি দরিদ্র, সংসারের ভারে ভারাক্রান্ত, রঘুপতি করুল অভাবের জ্বালায় আত্মহত্যা! অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে হরিচরণ পাণের দোকান করেছে, নলিনাক্ষ জুটিয়েছে,

উকীলের মুহুরিগিরি; কুঞ্জলাল করছে বীমা কোম্পানীর দালালী,—এম্‌নি আর আর সব। এদের মাঝখানে আমি নিঃসঙ্গ একা। তারপর মা। মায়ের দুঃখ মানুষের ঘোচাবার সাধ্য নেই; তার পরে ভগবতী, ভগবতীর কপালে গভীর অপকলঙ্ক আঁকা, প্রিয়ম্বদার জীবনে নানা সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব,—এদেশের মেয়েদের অবস্থা আমার চেয়েও তুমি ভালো জানো হেমন্ত। তাই ত বলছিলাম জগদীশকে, নিজেদের ব্যক্তিগত চিত্তবিলাস নিয়ে দিন কাটাবার অবস্থা আমাদের নয়, অনেক উদ্বেগ আর অশান্তির কাঁটায় আমরা ক্ষত-বিক্ষত।

চুপ করলাম। হেমন্ত মৌনমুখে চ'লে গেল। আমার কণ্ঠে ক্ষমা-প্রার্থনা ও অনুতাপ প্রকাশ পেল কিনা আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না, আবার দালান পার হয়ে ঘরের ভিতরে জগদীশের বিছানার এক ধারে এসে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরেই হেমন্ত ফিরে এল। বাড়ীর অন্যান্য দিকের গোলমাল তখন শান্ত হয়েছে। হেমন্ত বললে, আসুন, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

জগদীশ উঠে পড়ল। বললে, চলো। কিন্তু এর মধ্যেই দিলে হেমন্ত?

কাল সকালে যাবেন, খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন।—

যে দীপশিখা এই কদিন উজ্জ্বল হয়ে জ্বল্‌ছিল তা যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। অপরাধটা আমার আর তাতে সন্দেহ নেই। সত্য স্নেহের পাশেই থাকে সত্য অভিমান। হেমন্ত দূরে সরে যায়নি কিন্তু নিজেকে নির্লিপ্ত রেখেছে, আত্মশাসন ক'রে আপনাকে সতর্ক করেছে।

আহারাদির পর জগদীশ সোজা উঠে চ'লে গেল বাবুর কাছে। কাল সকালে চ'লে যাবে, সুতরাং শ্বশ্রূমাতার নির্দ্দেশে ছেলেটির

কাছে কিছুক্ষণ ব'সে গল্প করতে গেল। কিন্তু জগদীশের হাতে ছেলে ভুলানো গল্প-সংগ্রহ বিশেষ ছিল না। এক সময় সবিস্ময়ে দেখা গেল, নিদ্রিত বাবুর গায়ে ডান হাতখানা রেখে জগদীশ পরম নিশ্চিন্ত মনে বিছানার উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তাকালাম হেমন্তর মুখের দিকে, হেমন্ত তাকাল আমার চোখের প্রতি। বললাম, তোমার জায়গাটা ত দখল করলে, তুমি শোবে কোথায় ?

তাই ত ভাবছি। না হয় মা'র কাছেই শোবো আজ।

কিন্তু রাত্রে যদি বাবু ওঠে ? রোগা ছেলে।

ওঠে যদি আসব। আপনি একা নিচে শুতে পারবেন ত ?

শুতেই হবে। লোকে নির্ভয়ে উত্তর মেরু আবিষ্কার করতে যায় আর অমি দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে শুতে পারব না ?—এই ব'লে উঠে দাঁড়ালাম।

একটু দাঁড়ান্, আলোটা দেবো আপনার সঙ্গে। আগে এ ঘরের মশারিটা ফেলে দিয়ে যাই।

মশারিটা ফেলে বিছানার তলায় তার প্রান্ত গুঁজে দিয়ে আলোটা কমিয়ে সে যখন ফিরে দাঁড়াল তখন অকস্মাৎ মশারির ভিতর থেকে জগদীশ কথা ক'য়ে উঠ্‌ল। বললে, নরম বিছানা আর শরীরের ক্লান্তি, উঠতে আর ইচ্ছা হোলো না হেমন্ত।

বেশ ত জামাইবাবু, থাকুন না ? হেমন্ত হেসে বললে।

তুমি গিয়ে সোমনাথের মশারিটাও টাঙিয়ে দিয়ে এসো ভাই, নৈলে ও হতভাগা ম্যালেরিয়া নিয়ে গিয়ে আমাকেই বিপদে ফেলবে। আচ্ছা, উইশ ইউ গুড্ নাইট্।

গুড্ নাইট্, জামাইবাবু।—ব'লে আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে হেমন্ত বেরিয়ে এল। মুখ চোখ তার দীপ্ত ও উৎসাহিত। এদিক

ওদিক একবার তাকিয়ে বললে, মা বোধ হয় ঘুমিয়েছেন, সাড়াশব্দ নেই।—এই ব'লে সে অগ্রসর হোলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে পুনরায় বললে, জামাইবাবু ওঘরে শুলেন কেন জানো?

কেন?

দিদি থাকতে ওই ঘরেই উনি শুতেন। দিদির মৃত্যুর দিনে ওই ঘরেই শুয়েছিলেন বাবুকে নিয়ে।

আজ শুলো কেন?

বোধ হয় এই জন্যে যে, কাল চ'লে যাবেন। আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও, বাবুকে আমি যেন ওঁরই মতন ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে পারি।

ওঁর মতন ক'রে? ছেলে দুঃখ পাবে যে হেমন্ত?

পাক্ কিন্তু চরিত্রটা হবে বড়। দুঃখের সাধনা করেই বড় হবে তোমরা। বড় হবে ব'লেই তোমরা এত নিচে পড়েছ।

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, একথা তুমি বিশ্বাস করো হেমন্ত?

করি, তাই তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে আমি আহা বলিনে, কেবল চেয়ে থাকি। চেয়ে থাকৃব তোমাদের পথের দিকে, দেখ্‌ব কোথা থেকে তোমাদের যাত্রা, কোথায় গিয়ে শেষ। তুমি কি মনে করো সোমনাথ, ভগবান তোমাদের দুঃখ দিয়েছেন শুধু মাথা হেঁট ক'রে দেবার জন্যে? এত বড় অবিবেচক তিনি নন্। দুখঃই তোমাদের পরীক্ষা, পুড়ে-পুড়ে তোমরা খাঁটি হবে, বলশালী হবে। দুঃখ তাদেরই জন্যে দুঃখ যারা সইতে পারে।

বললাম, কিন্তু ততদিন কি জীবন থাকবে?

থাকবে, থাকবে, ভয় করো না জীবনকে। সবই মেনে নেবে,

সবই অস্বীকার করবে তবে পাবে গতি উপদেশ তোমাকে দেবো না সোমনাথ, কিন্তু একদিন দেখবে সুখ-দুঃখের অর্থ তোমার উদার আদর্শবাদের কাছে সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। তোমার কাছে এই ক'দিন থেকে অন্তত এইটুকু আমি শিখেছি।

তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হঠাৎ বললাম, তোমার এই সান্ত্বনা আমি কোনোদিন ভুল্‌ব না হেমন্ত।

হেমন্ত হাতখানা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমি যেন তোমার মনে থাকবার যোগ্য হতে পারি। আমার ত সবই ভেঙে গেছে সোমনাথ, শেষকালে তোমাকে পেলুম অনেক আরাধনায়, অনেক সৌভাগ্যে। তোমার জন্যে নিজের জীবন প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে, ভাবছি ভালো ক'রে বাঁচবো তোমারি জন্যে।

হেসে বললাম, কাল আমাকে যেতেই হবে কিন্তু।

যাও। দূরে গেলেই জান্‌ব তুমি কাছে আসবে। আমি যদি খাঁটি হই তবে একদিন আমাকে না হ'লে তোমার চলবে না সোমনাথ,—এই আমার অহঙ্কার, এই আমার আশা।

বললাম, কিন্তু এর কলঙ্কের দিকটা কি তোমার জানা নেই?

ভয় করিনে। দেখলুম অনেক, জানলুম অনেক। আজকের সত্যটা কালকে তুচ্ছ হয়ে যায়। আজকের নিন্দা কালকে হয়ে ওঠে সুখ্যাতি। আজকের কলঙ্ক কাল হবে জয়তিলক। সমাজের বিচার-ব্যবহারের কি কোন সঙ্গত অর্থ খুঁজে পেয়েছ কখনো? এই বাংলা দেশেরই এক উচ্ছৃঙ্খল কবিকে সমাজ একদিন আহার আর আশ্রয় দেয়নি, জ্বালায়-যন্ত্রণায় শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে তাঁর, অথচ আজ সভাসমিতি ক'রে সেই ভদ্রলোকের মৃত্যুতিথি পালন করা হয়, সমাধির

ওপরে পড়ে চোখের জল আর ফুলের মালা। এই নিয়ম চিরদিনের। ওঠো, মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাই।

উঠলাম না। তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

হেমন্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল। বললে, পাগলামি ক'রো না, ওঠো। কালাচাঁদটা বোধ হয় এখনো ঘুমোয়নি।

বললাম, মশারি টাঙাবার দরকার নেই।

সে কি?

আলোটাও জ্বলুক, দরজাও থাক্ খোলা, আজ সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে যাবো।

হেমন্ত পুনরায় হেসে বললে, এমন আব্দার ধ'রো না, এ তোমার অল্প বয়সের নেশা, সোমনাথ।

বললাম, যে সময়টুকু আর আছি তোমার কাছেই থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কাছেই ত আছো। আমার দুই ডানার তলায় তোমায় রেখেছি। আরো কাছে আসবে যেদিন পড়বে বিপদে।

কোথায় পাবো সেদিন তোমাকে?

ডাকলেই পাবে। যদি না ডাকো ক্ষতি নেই। তোমার অফুরন্ত পথে আমার মন থাকবে তোমার পিছু পিছু। তুমি নেবে ফুল আমি নেবো কাঁটা।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে রইলাম। পরে বললাম, তুমি শুনেছ জগদীশের সঙ্গে যা স্থির করেছি?

কি?

সবাই মিলে দল বাঁধব। মা'কে আন্‌ব পুরোভাগে। দল বেঁধে সবাই মিলে যাবো উপনিবেশ গড়তে। আদর্শ সমাজ গড়ব। যে-দুঃখ

অন্তরের তা হয়ত ঘুচবে না, কিন্তু যে-অভাব নিত্যদিনের তা হয়ত মোচন করতে পারব।

হেমন্ত বললে, আদর্শ সমাজটা কি?

এই ধরো মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ। শিক্ষায়, জ্ঞানে, সভ্যতায়, চিন্তাধারায় সবাই পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু। সম্পত্তির সবাই সমান অংশীদার, সবাই সম-অবস্থাপন্ন।

ঘুচবে না তা'তে দুঃখ। কাজে কর্ম্মে সবাই হয়ত খাঁটি হবে কিন্তু জানো ত, সমস্ত অন্যায়ের বাসা মানুষের মনে। মানুষের দল যেখানেই যাবে সেইখানেই জমবে জঞ্জাল, এক সমস্যা থেকে অন্য সমস্যা। তোমাদের সৃষ্টির ভিতরেই থাকবে ধ্বংসের বীজমন্ত্র, আবার এক নতুন দল নেবে সেই মন্ত্রে দীক্ষা, তোমাদের দেবে চুরমার ক'রে, যাবে আবার নতুন উপনিবেশ গড়তে।

বললাম, হেমন্ত, এরই নাম চক্রগতি। চিরস্থায়ী কিছুই নয় তাই জেনেই যাবো,—আমাদের কর্ম্মক্ষয় হবে ত। এর দার্শনিক দিকটা যদি বাদও দাও তাহলেও দেখবে আমাদের একটা উপায় হোলো। আমাদের বাঁচারও একটা কৈফিয়ৎ পাবো, জীবনধারণের একটা অর্থ মিলতে। লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে যদি মাঠে চাষ করতে নামি তবে প্রতি মুহূর্ত্তের সন্দেহ আর সংশয় থেকে নিজেদের নিষ্কৃতি দিতে পারব। বলতে পারব মানুষের দরবারে যে, এইজন্যে একদা আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম। খুসি করব নিজেদের।

হেমন্ত বললে, নিজেদের কথাটাই কেবল ভাবলে, আমার ব্যবস্থা কি করলে?

হেসে বললাম, ওই ত বললে তোমার মন থাকবে আমার পিছু পিছু?

ঠাট্টা ক'রো না।

তোমার জন্যে কি করব বলো? বলো কি চাও?

কিছু না। তোমার জন্যে কি করব তাই জিজ্ঞেসা করো।

ভয় করে হেমন্ত, জিজ্ঞাসা করতে। আমার জন্যে সব তোমার তুচ্ছ হবে তাই ভয় করে। সবাইকে খুসি করা ভালো, না সবাইকে অস্বীকার করা ভালো একথা আজও বুঝতে পারিনি।

হেমন্ত বললে, তোমার জন্যে সব তুচ্ছ হবে সেই আমার গৌরব। যেখানে ত্রুটি থাকবে সেইখানেই থেকে যাবে তোমার প্রতি আমার ফাঁকি। বুঝতে পেরেছ?

না।

তবে বুঝবে না কোনদিন। বিধাতার বুদ্ধিহীনতার দিকটা প্রকাশ পেয়েছে পুরুষ জাতিটার মধ্যে, তাই আমাদের এত জ্বালা। রোগে-দুঃখে যেদিন আমাকে দরকার হবে সেদিন পাবার ব্যবস্থাটা কি করলে?—এই ব'লে হেমন্ত ডান হাতে সস্নেহে আমার মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিল।

সে ব্যবস্থা তোমার হাতে। দাও এবার মশারি টাঙিয়ে। ব'লে হেসে পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বিছানাটা সে গুছিয়ে পাততে লাগল, আমি বাইরে এলাম। রাত গভীর হয়েছে, অনুমানে ঠিক বোঝা গেল না কত। এদেশে যে মানুষের বসতি কোথাও আছে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। গ্রামের চৌকীদারও অনেকক্ষণ পূর্ব্বে দু'একটা হাঁক দিয়ে চলে গেছে। লোকটার ভূতের ভয় অত্যন্ত বেশি, এবং এতই বেশি যে তাড়ি খেয়ে বেহুঁস হয়ে তবে টহল্ দিতে বেরোয়।

আকাশ যে অন্ধকারে কখন্ স্বচ্ছ হয়ে গেছে জানতে পারিনি,

শ্রাবণের দিনে সচরাচর এমন নক্ষত্রভূষিত পরিচ্ছন্ন আকাশ চোখে পড়ে না। পশ্চিম দিকে তাল ও খেজুরের জঙ্গলের পাশে শুক্লপক্ষের চন্দ্র এইমাত্র নেমেছে, তারই আভাসটা চারিদিকে ছড়ানো। রাত্রি যে এত নিবিড় এত রহস্যময় হতে পারে এ আমার জানা ছিল না। শরীরে চেতনা রয়েছে কিন্তু মনে নেই। চোখ বুজে যতদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাই, অবশ ও অভিভূত। এমন ঐশ্বর্য্যবান নিজেকে আর কোনো অবস্থাতেই মনে হয়নি। মনে হোলো, ভালবাসা দেবত্বলাভ করে তখনই যখন প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে বৃহৎ কল্যাণবোধ জাগ্রত হয়। কেমন যেন চলৎশক্তিহীন হয়ে যাচ্ছি, একটি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ সমস্ত শিরা-উপশিরার রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছে, জানিনে আর কতক্ষণ আমি সচেতন থাকতে পারব। যেন এক অত্যাশ্চর্য্য পানীয় আকণ্ঠ সেবন ক'রে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছে।

হাতটা বাড়ালাম। অতি ধীরে, বাতাসের উপর ভর দিয়ে। একটা লেবুগাছের ডালে হাতটা ঠেকল। ধীরে, ধীরে, ধীরে অনুভব করলাম। রোমাঞ্চকর আনন্দে আঙুলগুলি যেন কাঁপছে, কেবলই কাঁপছে। রোমকূপ কাঁপছে, চেতনা কাঁপছে। অদ্ভুত একটা গন্ধে নেশা ধরেছে, সে-গন্ধে প্রাণের মূল পর্য্যন্ত সজীব হয়ে উঠেছে। পাশেই ছিল দেয়াল, অতি ধীরে তার গায়ে মুখ রেখে আবার—আবার সেই গন্ধ আস্বাদ করলাম। সমস্ত স্নায়ু অবসন্ন হোলো সেই অদ্ভুত গন্ধে। এ যেন এক বিশাল মায়াপুরি, বহির্জগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, এর স্বভাব আলাদা, মানুষ এখানে এলে তার চরিত্র যায় বদলে।

ঘরের ভিতরে এলাম। সেই টেবল, জলের পাত্র, জামা, কাপড়ের

আল্‌না, একখানা ইজি-চেয়ার, কয়েকখানা বই, ছোট স্যুটকেশ, বিছানা ও মশারি,—কিন্তু এরা সেই অতি-পরিচিত বস্তু নয়, এরা যেন কোথা থেকে অনির্ব্বচনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। এরা যেন কথা কইছে পরস্পরের সঙ্গে, সেই দুর্জ্ঞেয় ভাষা আমি চক্ষু দিয়ে স্পর্শ করতে পাচ্ছি। কাছেকাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তন্ন তন্ন ক'রে তাদের পরীক্ষা করলাম। সবই চেনা, সবই নিত্য ব্যবহারে সুপরিচিত, কিন্তু আজকের রাত্রে তারা সব যেন এক দুর্ব্বোধ্য রহস্যে আবৃত, আমার ও তাদের মাঝখানে সুদূর ব্যবধান। সর্ব্বশরীরে আমার আলো এসে পড়েছে, প্রতি রোমকূপের ভিতরে আলো প্রবেশ করেছে, আত্মার দেশ হয়ে উঠেছে আলোকিত,—অস্তিত্বের পরপার আনন্দের তরঙ্গে আন্দোলিত।

সোমনাথ ?

মুখ তুললাম হেমন্তের দিকে। তাকে আর চিনতে পাচ্ছিনে। সে যেন কোন মায়াকাননের মায়াবিনী।

কি হচ্ছে বলো ত ? ব'লে সে কাছে স'রে এসে দাঁড়াল, আঁচল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, পাগল পাগল তুমি। এই চব্বিশটা বছর যে তোমার কেমন ক'রে কেটেছে আমি তাই ভাবি। ঘুমোও এবার, আমি চললুম। কাল তুমি যাবে বটে কিন্তু জানিনে আর কতদিন তোমাকে—তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না, সোমনাথ।

বললাম, তোমাকে যিনি এনে দিলেন, তাঁর পায়ে আমি প্রণাম জানাই, হেমন্ত।

আমিও জানাবো।—ব'লে হেমন্ত আর দাঁড়াল না, আলোটা কমিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দ্রুতপদে সে চ'লে গেল।

কলিকাতার পথে নেমে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলাম। জনসাধারণের কোলাহলে কতদিনের স্বপ্ন যেন ভেঙে গেল, চোখের উপর থেকে একটা পর্দ্দা স'রে গেল। জানিনে সত্য কোনটা।

বললাম, কোন্‌দিকে যাবে জগদীশ ?

জগদীশ বললে, সোজা যাব আশ্রমে।

তারপর ?

তারপর প্রিয়ম্বদা-সন্দর্শনে যাত্রা।

বৌদিকে এখনো মনে আছে তোমার ?

জগদীশ হেসে বললে, তাঁর মনে আছে কিনা তাই ভয় হচ্ছে।

বললাম, দেখোগে হয়ত এতদিনে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে স্বামীর ঘরকন্নায় মনোনিবেশ করেছেন।

তাই দেখলে খুসি হবো।

কিন্তু তাহলে তোমার স্থান হবে কোথায়, জগদীশ ?

রাস্তার মোড় পার হয়ে এসে জগদীশ হাসল। বললে, যথাস্থানে। তোরা কি মনে করিস চোরাবালিতে আমি ঘর বেঁধেছি? যাবি ত আয়।

বললাম, আমি যাবো মার ওখানে। তোমারো যাওয়া উচিত ছিল,—মা'র চেয়ে তোমার আপনার আর কে আছে বলো ?

তা ত বটেই, সেই জন্যেই সব শেষে যাবো তাঁর কাছে। তুই তবে এখন যা, গিয়ে বাবুর কুশল-সংবাদটা দিস।

আচ্ছা।

জগদীশ দ্রুতপদে গিয়ে মোটর-বাসে চ'ড়ে বসল। চীৎকার ক'রে তখনি একবার বললাম, আবার কোথায় দেখা হবে ?

গলা বাড়িয়ে সে বললে, কাল বেলা দুটোয় 'দুর্নীতি-দমন-সঙ্ঘের' আপিসে। লোকনাথের সঙ্গে দেখা হলে তাকেও নিয়ে যাস।

আচ্ছা, ব'লে অগ্রসর হলাম।

জামার পকেটে কিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল, কাছেই একটা হোটেল্ দেখে ঢুকে পড়লাম। উদরের ক্ষুধা সকলের চেয়ে বড় সত্য।

চায়ের সঙ্গে কিছু জলযোগ সেরে বাইরে এসে ট্রামে উঠে পড়লাম। পকেটে অর্থ না থাকলে সভ্য জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে, থাকলে ব্যয় করতে কার্পণ্য করিনে। সঞ্চয়ের ক্ষুধার চেয়ে ব্যয়ের ক্ষুধা আমাদের প্রবল।

মায়ের বাড়ীতে এসে যখন পৌছলাম তখন অপরাহ্ণ। মেঘে ঢাকা দিন, বেলা চেনা যায় না। সুসংবাদের স্রোতে ভাসতে ভাসতে উপরে গিয়ে উঠলাম। দরজার সুমুখে পর্দ্দা টাঙানো। প্রথমেই পুরুষ কণ্ঠের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কানে এল। সাড়া না দিয়েই পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। সুমুখেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মা বসেছিলেন তাঁর কাছে, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এসো বাবা, কখন্ ফিরলে ?

বললাম, এই চারটের গাড়ীতে মা। বাবু বেশ ভালো আছে, আর ভয়ের কারণ নেই। জগদীশ পরে আসবে।

মা ভদ্রলোকটীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন,—এঁর নাম শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরী। হাইকোর্টে ওকালতি করেন।

প্রসন্নবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কে ?

ওটি আমার ছোট ছেলে। শ্রীমান সোমনাথ চৌধুরী।

তুমি কি করো বাবা? পড়ো?

বিনীত কণ্ঠে বললাম, আজ্ঞে না।

চাকরি করো?

চাকরি খুঁজে পাচ্ছিনে।

প্রসন্নবাবু হঠাৎ মুখ তুলে মার দিকে চেয়ে বললেন, এরই কথা তুমি বলছিলে সেদিন? বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে?

হ্যাঁ এরই কথা।

প্রসন্নবাবু সস্নেহে হেসে বললেন অন্যায় তুমি কিছুই করোনি বাবা, আমি সব শুনেছি তোমার মায়ের মুখে। আশা করব একদিন তোমার বাবা নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

আমি হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম।

আরো দু'চার কথার পর প্রসন্নবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজ তবে আসি অনুরূপা।

আজ এতকাল পরে মায়ের নাম শুনতে পেলাম। মায়েরো যে একটা নাম আছে এ আমরা কেউই খেয়াল করিনি। মা কেবল ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন, এবং প্রসন্নবাবুর পিছু পিছু বাইরে গেলেন।

শোনা গেল না আর কি কথাবার্তা তাঁদের হোলো কিন্তু পর্দার নিচের ফাঁকে ক্ষণেকের জন্য আমার দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম, মা'র একখানি হাত প্রসন্নবাবুর জুতা পরা পা দুখানাকে স্পর্শ করল। আমার জীবনে এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সংসারে আমার চোখে যাঁর আসন সকলের উঁচুতে, তাঁরো যে কেউ প্রণম্য থাকতে পারেন এ আমার ধারণার অতীত ছিল।

সিঁড়ি দিয়ে প্রসন্নবাবু নামতে লাগলেন। মা আবার এসে ঢুকলেন ঘরে। মেঝের উপর একখানা সতরঞ্চি বিছানো ছিল, মা

তার উপর ব'সে জান্‌লার দিকে চেয়ে রইলেন। অনেক কথা আসতে আসতে ভেবেছিলাম। প্রথমেই বল্‌ব হেমন্তের কথা, বল্‌ব কেমন সে লক্ষী মেয়ে, বল্‌ব সে আমার কত আপন। তারপর প্রস্তাব করব উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কথা, পল্লী-জীবনের সারল্যের কথা, আমাদের নব আদর্শের কথা। যাকে আমরা টেনে নিয়ে যাবই, মায়ের পিছনে থাকব নব দীক্ষায় দীক্ষিত নবীন সন্তানের দল, গড়ব গিয়ে মাতৃমন্দির, সৃজন করব অভিনব আনন্দমঠ। কিন্তু কেমন যেন হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম, প্রথমটা কথা ফুটল না।

এদিক ওদিক একবার চেয়ে আস্তে আস্তে বললাম, ভগবতীর কোথায় চাকৃরি হোলো মা ?

মা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বললেন, চাকৃরি ? হ্যাঁ, ভালো চাকৃরি হয়েছে তার, আমাদেরই ইস্কুলে।

এইবার সে একদিন আমাদের খাওয়াবে ত ?

না সোমনাথ, চাকৃরি তার শীঘ্রই নষ্ট হবে।

কেন মা ?

কেন ?—মা অকস্মাৎ বিদীর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, কেন তা তোরা কি বুঝবি, তোরা লক্ষীছাড়ার দল, যা কিছু ভালো যা কিছু সত্যি, সব তোরা চুরমার ক'রে ভেঙে দিতে চাস অবহেলায়। যারা নিরপরাধ, তোদের আওতায় প'ড়ে তারা ধ্বংস হয়। তোদের নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবো আমরা ? মরণ কেন হয় না আমাদের ?

মায়ের চিত্তবিকারের কারণটা কিছুই বুঝতে পারলাম না. নিঃশব্দে কেবল তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু তিনি থামলেন না, বলতে লাগলেন, যা যা, জাহান্নমে যা তোরা, সভ্য ব'লে আর অহঙ্কার জানাসনে লোকের কাছে। তোদের মনুষ্যত্ব আর তোদের শিক্ষা।

ছাই! বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার দাম কত তা জানিস তোরা? জান্‌তো প্রাচীন কালের তারা, মানুষের ধর্ম্ম ছিল তাদের। তোরা কি দিলি আমাদের বাবা, বুকের রক্ত দিয়ে গড়লুম তোদের, তার বদলে তুঁষের আগুনের ব্যবস্থা করলি? জান্‌লি কেবল স্বেচ্ছাচার, জান্‌লি বিপ্লব, উন্মাদের বেপরোয়া মতিভ্রমকে বল্‌লি বিদ্রোহ? জান্‌লিনে যে সর্ব্বনাশেরো একটা ছন্দ আছে?

কি হোলো মা?

মায়ের চোখ দুটি তখন অশ্রুতে ভ'রে এসেছে। তিনি রুদ্ধ-কণ্ঠে বললেন, বলতে পারব না বাবা কি হয়েছে। কিন্তু ভাবছি, আবার বাড়লো পাপের ভার এ যুগে, আবার ভারী হোলো অপমানের বোঝা, লজ্জায় হোলো মাথা হেঁট। সোমনাথ, আমি ভেবেছিলুম তোরা বুঝি মানুষের মধ্যে গণ্য, তোরা বুঝি উচ্ছেদ করবি স্বার্থপরতাকে মানুষের সমাজ থেকে, তোরা বুঝি মেয়েমানুষের বাঁচার পথ দেখিয়ে দিবি, কিন্তু আবার দিলি ডুবিয়ে, আবার কলঙ্ক মাখিয়ে দিলি জীবন জুড়ে? মনে কি নেই যে, যুগের পাপ যুগান্তরে গিয়ে ফলে?

মনে আছে মা।

না নেই। একশোবার নেই। কে বলেছে তোরা স্বাধীন হবার যোগ্য। পাপ রয়েছে তোদের রক্তে, অজ্ঞান রয়েছে নাড়িতে নাড়িতে জড়িয়ে। রুচির বড়াই করিস বাণীপদর দল নিয়ে, ত্যাগের বড়াই করিস সন্ন্যিসির পাল লেলিয়ে দিয়ে? মনের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে ফেল্‌তে পেরেচিস্?

এবার বললাম, তোমার গোড়ার কথাটা এখনো বুঝতে পারলুম না, কেবল ধমকই দিয়ে যাচ্ছ।

মা চোখের জল মুছলেন। উত্তেজনা কিয়ৎপরিমাণে কম্‌লে

তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে এ সমস্ত তুলে দিয়ে চ'লে যেতে হবে সোমনাথ, আর থাকার উপায় নেই।

উত্তরটা তিনি নিজেই দিলেন। বললেন. ভয়ানক বিপদে আমি পড়েছি বাবা, এর থেকে উত্তীর্ণ হতে গেলে আমাকে সমস্ত ত্যাগ ক'রে কোনো একদিকে চ'লে যেতে হবে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মা মুখ তুলে বললেন, কোথা যাস ?

বললাম ভগবতী কোথায় ?

আছে তার ঘরে। দাঁড়া, আগে শুনে যা, ভগবতী বলেছে, সংসারে আর কারো মুখ সে দেখবে না।

থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, তাই যদি হয় তবে আমিও তার মুখ দেখতে চাইব না কোনোদিন।

মা বললেন, বেশ, যাও এবার।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পার হয়ে ভগবতীর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বিছানায় মুখ গুঁজে প'ড়ে সে কাঁদছিল। বোঝা গেল আমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তাই সে শুনেছে। কাঁদছে সে ফুলে ফুলে, ডুক্‌রে ডুক্‌রে। কি করব, কি যে বলব তা আর থৈ পেলাম না।

অত্যন্ত বিসদৃশ লাগল। বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার একখানা হাত ধ'রে ডাকলাম, মিনু ? ও মিনু ?

উত্তরও দিল না, কান্নাও তার থাম্‌ল না। বললাম, এর মধ্যে এমন কি হোলো মিনু যার জন্যে এমন প্রতিজ্ঞা করলে ? তুমি পাশ করেছ, চাকৃরি পেয়েছ, তোমার আর ত কোনো দুশ্চিন্তাই থাকা উচিত নয়। আমরা সবাই কত আনন্দ করলাম। কেঁদোনা, ওঠো ভাই। কি হয়েছে বলো ত ? মা অমন করছেন কেন ?

সে আমার হাতের ভিতরে। মুখ লুকিয়ে কেঁদে বললে,

সোমনাথদা, ব'লে দিন্ আমার কেমন ক'রে মৃত্যু হবে, আর আমি একদিনো বাঁচতে চাইনে।

হেসে বললাম, বাঁচতে চাও না? সত্যি? কিন্তু মরবার চেষ্টা করলেও যে পুলিশে ধরবে। বলো, শোনা যাক্ তোমার মামলাটা। আমি খুব ভালো ওকালতি করতে পারি তা জানো মিনু?

কান্নায় সে ফুল্‌ছিল তখনো। বললাম, মা আজ চ'টে রাঙা, কি হয়েছে বলো ত ভাই? দুর্ভাগ্যবশত আমিই আজ সামনে প'ড়ে গেছি। তুমি ত দেখে আসছ বরাবর, মাতৃস্নেহের বেলা আর সবাই কিন্তু মাতৃলাঞ্ছনার বেলা কেবলমাত্র আমি। বলো ত মা'কে ঠাণ্ডা করা যায় কি ক'রে?

ঠাণ্ডা আর উনি হবেন না, সোমনাথদা।

হবেন না? চেনো না তুমি মা'কে। থাকতো এখানে বঙ্কিম, দেখতে। কোথায় গেল বঙ্কিম? আসেনি আজ? তুমি যে-কান্নাটা আজ কাঁদলে,—আমি কিন্তু সব ব'লে দেবো বঙ্কিমকে। শুন্‌বে নতুন খবর? তোমার আর বঙ্কিমের গল্পটা ক'রে এলাম হেমন্তর কাছে।

ভগবতী একটি কথাও বললে না, কেবল বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে বালিশের তলা থেকে একখানা খাম বা'র ক'রে আমার হাতে দিল, এবং দিয়েই সে বিছানা ছেড়ে নাম্‌ল, বললে, আমার মৃত্যুই শ্রেয় সোমনাথদা।

খামখানা তাড়াতাড়ি খুললাম। চিঠিখানা বঙ্কিমের। দেখি ভগবতীর চিঠির সঙ্গে সে আমাকেও লিখেছে।

এ কি, এর মধ্যে সে বম্বে চ'লে গেল ? জানালোনা আমাদের ?— বলতে বলতে চিঠিখানা পড়তে সুরু করলাম—

সাণ্ডহারষ্ট, বম্বে।

ভাই সোমনাথ,

অনেক দৌরাত্ম্য ক'রে এবার নিলেম বিশ্রাম। এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি জাহাজে। বিলাতে গিয়েই ইন্‌জিনিয়ারিঙ পড়ব। ছ' বছর লাগবে। তারপর আশা আছে আমেরিকায় যাবো চাকুরি নিয়ে। কিন্তু সেখানকার স্থায়ী নাগরিক হয়ত আমায় হতে দেবে না, দেখা যাক্ কি হয়। দেশ আমার ভালো লাগল না, তাই চললুম দেশান্তরে। দেখ্‌ব পৃথিবীকে, জানব নিজেকে।

হঠাৎ এসেছি চ'লে। কারো কাছে বিদায় নেওয়া হয়নি। মা'কে প্রণাম জানিয়ো। বন্ধুদের প্রীতি। আশ্রমের ঠিকানায় মাঝে মাঝে চিঠি দেবার ইচ্ছা রইল, তখন তুমিও চিঠি দিয়ো।

তোমাদের বঙ্কিম

ভগবতীর পত্রও পড়লাম—

স্নেহের ভগবতী

আশা করি ভালো আছ। আমি দীর্ঘকালের জন্য যাচ্চি, জানিনে ফিরবো কবে। তোমাকে যখনই মনে পড়বে, এই প্রার্থনাই কেবল করব তোমার কর্ম্মজীবন সফল হোক, সুন্দর হোক।

বঙ্কিম

তাকালাম ভগবতীর দিকে, বুঝলাম সব। মনে হচ্ছে ঘরের ভিতরে যেন বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, চারিদিকে যেন স্তম্ভিত, নিস্পন্দ। একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোথায় যাবো ? কা'র কাছে জানাবো বঙ্কিমের দুর্ব্যবহারের কথা ? সে যে আমারই বন্ধু !

বললাম, ভগবতী, বঙ্কিম যেদিকে গেছে সে পথে যদি তার জীবনের উন্নতি হয় এ তুমি চাও না ?

ও চিঠির মানে তা নয় সোমনাথদা।

তা জানি। যাবার আগে কি তুমি কিছুই জানতে পারোনি ?

না।

কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল ?

একটুও না।

আশ্চর্য্য, তবুও গেল চ'লে ? বৈচিত্র্যের ক্ষুধা মানুষকে এমন নিষ্ঠুর করে ? মান্‌ল না কোনো স্নেহের বন্ধন ? মান্‌ল না ভালোবাসা ?

ভগবতী পাষাণ হয়ে ব'সে রইল। এর পরে কী কথা বলা সঙ্গত, খুঁজে পেলাম না। কেবল এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, বেশ, নিষ্ঠুর যখন সে নিতান্তই হোলো, তুমিই বা কেন চোখের জল ফেল্‌বে মিনু ? কে অপেক্ষা করে কা'র জন্যে ? ভালোবাসা ? তার আগে আত্মসম্মান ! তুচ্ছ ক'রে দাও হৃদয়াবেগ, পথের জানাশোনা পথের মাঝখানে শেষ ক'রে দাও, মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও মিনু।

মাথা হেঁট হোয়ে গেছে, সোমনাথদা।

হয়নি। তুলতে জান্‌লে আবার উঠ্‌বে মাথা। একদিন যে তোমাকে ভালোবেসেছে তাকে ছোট ক'রো না। যেটুকু পেয়েছ তাই বড় ক'রে নাও, ওই তোমার পাওনা। ব্যর্থ হয়েছ ? কাঁটা ফুটেছে ? তাই মেনে নাও। সার্থক হবে জীবন, এ আশাই বা কেন ? আজ যাই মিনু, আবার আসব। এসে যেন দেখি, তোমার মনে কোনো নালিশ নেই।

উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু দেখা গেল আমার সমস্ত উপদেশ মিথ্যা, ভগবতীর মুখে উৎসাহের রেখাপাতটি পর্য্যন্ত হয়নি, বর্ষণ-পাণ্ডুর আকাশের দিকে অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রয়েছে। সান্ত্বনা তাকে দেওয়াই ভুল।

ঘর থেকে বেরিয়ে মা'র কাছে পুনরায় গিয়ে দাঁড়াতে আর যেন পা সরল না। এদিককার সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে আমি চ'লে গেলাম।

পথে নেমে চলেছি কিন্তু অভিমান জমছে মনে মনে। আজ বঙ্কিমকে কাছে পেলে কিছু প্রশ্ন করতাম। জীবনে সে বহুবার ভালোবেসেছে এবং তার সব ভালোবাসাই আন্তরিকতাপূর্ণ। কোনো ফাঁকি নেই, সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ এই কি তার নীতি? আজ অকস্মাৎ উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আমার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এল। কোথায় চলেছে এরা? কী পরিণাম? হৃদয় নিয়ে খেলা, ক্ষণিক-বাদের খেলা, আপন দাহে আপনাকে ভস্মীভূত করে। ক্লান্তিহীন তৃপ্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় কী পাওয়া যায়? কেন হায় ছুটে নীতিজ্ঞানহীন আত্মবিনাশের দিকে? কেন এই প্রবঞ্চনা? কেন ভালোবাসার নামে মনুষ্যত্বের প্রতি এত বড় অপমান? আমার চোখে জল এল।

তবু জানি, অসচ্চরিত্র নয় বঙ্কিম। দেখেছি তার দাক্ষিণ্য, দেখেছি তার স্বার্থলেশহীন বন্ধুতা, দেখেছি তাকে বিপদের দিনে বিপন্নের সাহায্যের মধ্যে। ভুল ত করিনি, তার কবিপ্রাণের অসীম উদারতার কথা বন্ধুদের ভিতরে কে না জানে! ধনীর সন্তান, ভোগের মধ্যে সে লালিত, তবু দরিদ্র সঙ্গীদের সঙ্গে সে বেড়াত পথে পথে, আমাদেরই কল্যাণ-কামনায় কাটত তার দিনরাত। জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনার তরঙ্গে তরঙ্গে সে ভেসে বেড়িয়েছে, তার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি, বহু সংবাদ ও বহু নিন্দা প্রশংসা। কোথাও কোনো দায়িত্ব তার নেই, কোনো বন্ধনকে সে স্বীকার করেনি, কিছুতেই তার অপ্রতিহত গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাই তাকে ভালো লাগে। এই সংসারের সকল খেলায় বিজয়ী সে, নির্লিপ্ত সে। আমি ত জানি

তার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন চরিত্রের ভিতর আছে একটি বিরাট বৈরাগ্য। হাসি ও কান্নার বিচিত্র আলোছায়ায় তার আনাগোনা। কিন্তু তার সেই বৈরাগ্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমি যেন তাকে অবিচার না করি।

অথচ দেখছি তারই দস্যুপনায় বুক ভাঙ্‌ল এক নারীর। নিরপরাধ নিষ্পাপ পল্লীবালা আপন বক্ষের সর্ব্বোত্তম লাবণ্যটুকু দিয়ে পূজা দিয়েছিল তার পায়ে—প্রতারণায় বিষাক্ত ক'রে দিয়ে গেল সে সেই নারীর সমস্ত ভবিষ্যত জীবন। দয়াহীন, বিবেচনাহীন সে চাইল না পিছনে, চাইল না সুমুখে? নীতি—নীতির জন্য আজ প্রাণ উঠ্‌ছে কেঁদে। এ চল্‌বে না, এর মধ্যে তৃপ্তি নেই। এই শূন্যবাদ, এই খেয়াল, এই চৌর্য্যবৃত্তি,—এদের পিছনে রয়েছে ধ্বংসের ভয়ানক ইঙ্গিত। সততা ও সাধুতা, বিশ্বাস ও দায়িত্বজ্ঞান, মানবতা ও চিত্তের স্থৈর্য্য,—এদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে মন। আজ কেমন ক'রে যেন মনে হোলো, বঙ্কিমের মতো দরিদ্র আমাদের ভিতরে আর কেউ নেই।

অনেকদিন পরে গণপতির বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। পা দুটো আপনা থেকে চ'লে এল। সন্ধ্যা হয়েছে, আলো জ্বলেছে পথের মোড়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতর থেকে গোলমালের শব্দ কানে এল। ভাবলাম, চলেই যাই। কিন্তু কি ভেবে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, গণপতি আছ?

হঠাৎ সবাই চুপ ক'রে গেল। পর মুহূর্ত্তেই সবিস্ময়ে দেখলাম, ঝপাৎ ক'রে আমার মুখের উপরেই দরজাটা গেল বন্ধ হয়ে। কারণটা বোঝা গেল না। এমন কি অন্যায় করেছি আমি? দরজাটায় একবার ধাক্কা দিয়ে আবার ডাকলাম, গণপতি?

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের জবাব এল, কে তুমি?

গণপতিকে একবার ডেকে দিন্ ত ?

না, তুমি যাও।

বিস্ময়ে হঠাৎ নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। কিন্তু এমনভাবে অপমানিত কেন আমি হবো সেটা শুনে যাওয়া দরকার। আবার দরজায় আঘাত ক'রে বললাম, তাকে একবার বলুন যে সোমনাথ ডাকছে।

তখনই দরজা খুলে গেল। গণপতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একেবারে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং আমাকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়েই বললে, আয় ভাই, বুঝতে পারিনি যে তুই এসেছিস। ভিতরে চ'লে আয়, এখুনি একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে।—এই ব'লে সে আমাকে সভয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলে।

বললাম, ব্যাপার কি, গণপতি ?

ঘরের ভিতরে এসে গণপতি বললে, মেয়েদের সাবধান ক'রে রেখেছি। এখনি দাশু আসবে লোকজন নিয়ে। ভাগ্যি তুই এসে পড়লি সোমনাথ

বললাম, দাশু কে ?

আমার ভগ্নিপতি। খবরদার, তুই আগে এগোবিনে, পুলিশে তাহলে 'কেশ' খারাপ হবে। ওরা দরজা না ভাঙলে কিছু বল্‌ব না।

লোকজন নিয়ে আসবে ? কেন ?

আমার বোনকে নিয়ে যাবে ব'লে।

বেশ ত, স্বামী আসবেন, দেব পাঠিয়ে ?

পাঠাবো তার সঙ্গে ? গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে নয়—গণপতি উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল,—কী করেছে আমার বোনকে জানিস ? নেশার পয়সার জন্যে সব গয়নাগুলো একে একে খুলে নিয়েছে। জুয়া খেল্‌বে,

মদ খাবে। স্ত্রীকে ঠেলে পাঠায় বন্ধুদের কাছে টাকার লোভে। এমন মারে যে বনের পশুপক্ষী কেঁদে যায়, ছেলেমেয়েগুলোকে খেতে দেয় না,—তারপর কত যে অত্যাচার, তার একটি একটি কাহিনী শুন্‌লে তোর চোখেও জল আসবে সোমনাথ। সাধে কি রঘুপতি গলায় দড়ি দিয়ে অকালে মরেছে ?

বললাম, তার হাতে যখন দিয়েছ তখন না পাঠালে চল্‌বে কেন গণপতি ?

হাতে দিয়েছি আবার ফিরিয়ে নেবো। ন্যায়বিচার কি নেই ? প'ড়ে প'ড়ে কি শুধু মারই খেয়ে যাবো ? দেখ্‌বি আমার বোনকে। কান্না পাবে। ডাক্তার দেখে কাল বলেছেন, যক্ষ্মা ঢুকেচে শরীরে। মা কাঁদচেন।

তুমি ত দুর্ব্বল বাধা দেবে কেমন ক'রে ?

বাধা দেবোই। যদি না মানে, আগে আমি মরব তার পায়ের তলায়। ওই বুঝি এসেছে,—চুপ।

বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়ল। গণপতি আমার হাত চেপে ধরল। কিন্তু তখন নিষেধ করার আর কোনো অর্থ নেই। ঘরের ভিতর এদিক ওদিকে চেয়ে দেখলাম, অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কিনা। কিছু নেই, দুর্ব্বলের কাছে অস্ত্র থাকাও অপরাধ। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, মেয়েদের ওপরে পাঠিয়ে দাও।

আবার দরজায় ভয়ানক জোরে ধাক্কা পড়ল। গণপতি বললে, গুণ্ডা ভাড়া ক'রে আন্‌বে ব'লে গেছে। বোধ হয় তারাই।

দ্রুতকণ্ঠে বললাম, পড়ার লোককে দিয়ে পুলিশে খবর দিলেনা কেন ?

পাড়ার লোককে হাত করেছে দাও। বাগ্দীরা সব তার দিকে।

দরকার হ'লে মোড়ের বিড়িওয়ালা তাকে লোক জোগাবে। তা ছাড়া পুলিশে খবর দেবো? জানিসনে তুই পুলিশকে? পাশের বাড়ীর একটা ছোট ছেলের হাতে চিঠি দিয়ে মা'র কাছে খবর পাঠিয়েছি, এই একটু আগে।

সব কথা বলেছ?

বাইরে কর্কশ কণ্ঠে কয়েকজন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। গণপতি বললে, হ্যাঁ। ছেলেটা এখন বাড়ী খুঁজে পেলে হয়।

দুম্‌দাম শব্দে দরজা ভাঙাভাঙি সুরু হয়েছে। নানা কুশ্রী কটূক্তি, অশ্লীল গালিগালাজ। বোঝা গেল তাদের কারো কারো হাতে লাঠি আছে। নীরবে আর বসে থাকা চল্‌ল না। ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে বললাম, সাবধান!

উত্তরে দরজায় লাথি পড়তে লাগল। এত দুরবস্থার ভিতর দিয়ে এতদিন চ'লে এসেছি কিন্তু আজও রক্ত ঠাণ্ডা হয়নি! উন্মাদের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সদর দরজা খুলে দাঁড়ালাম। তাদের হাতে ছিল টর্চ্চ লাইট্ আর লাঠি। আলোয় আমার মুখ দেখে একজন বললে, গণপতি কই?

কি দরকার তাকে?

আমার বউকে বা'র ক'রে দিতে বলো।

তোমার স্ত্রীকে সে তোমার কাছে পাঠাবে না।

আলবাৎ পাঠাবে। স'রে যাও তুমি।

বললাম, এক পা এগোবে না, তাহলে বিপদ ঘটবে।

সেও জোর ক'রে ঢোকবার চেষ্টা করল, আমিও ছাড়ব না পথ। দেখতে দেখতে গণপতি এসে যোগ দিল। বিড়িওয়ালাদের লোক এল। পাড়ার দু'চারজন আধা গৃহস্থ আমাদের পক্ষে এসে যোগ দিল। পথ

হোলো লোকে লোকারণ্য। বাড়ীর দরজা ছেড়ে বিবাদটা এগিয়ে এল পথের মোড়ে, সরকারি আলোর নিচে। যারা হক্ কথা বলতে এসেছিল আমাদের পক্ষে, তাদের সঙ্গে শত্রুদলের আগেই মারামারিটা বাধলো। আমরা একটু ভদ্র সুতরাং একটু ভীরু। মুখটা সহজে খুলতে পারি, হাতটা সহজে তুলতে পারিনে। কিন্তু এ সংযমও শেষ পর্য্যন্ত আর রইল না। কি একটা ভয়ানক কটূক্তির উত্তরে 'মারো শালাকো' আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথমত হাতাহাতি; তার পর ধ্বস্তাধ্বস্তি, তারপর মারামারি, তারপর যে কাণ্ডটা ঘটতে লাগল তাতে সম্ভ্রম লজ্জা সভ্যতা ও মর্য্যাদার হোলো চরম সমাধি।

হাতে একখানা বাঁকারি সংগ্রহ করেছিলাম তাই বীরবিক্রমে ঘোরাতে লাগলাম। জানিনা অন্ধের মতো কতক্ষণ সেখানা ঘুরিয়েছি, কতজনকে আহত করেছি। কোথা থেকে একটা কাবুলিওয়ালা এসে জুটল। চিনি লোকটাকে। সুদ আদায় করতে এসেছিল গণপতির কাছে। কিন্তু গণপতির মৃত্যু হ'লে সুদ দেবে কে? সুতরাং সে আমাদের পক্ষ নিয়ে লাঠি চালাতে লাগল। এমন সময় ভয়ানক একটা হৈ হৈ রৈ রৈ সুরু হোলো। চার পাঁচ-খানা মোটর গাড়ী এসে থাম্‌ল। জনকয়েক হিন্দুস্থানী লাঠিয়াল বিদ্যুৎবেগে ব্যাঘ্রের মতো রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছনের একখানা গাড়ীর পা-দানিতে মায়ের মূর্ত্তি দেখা গেল। রণচণ্ডীর মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে মা উচ্চকণ্ঠে উৎসাহ দিয়ে চীৎকার করতে লাগলেন।

ভয়ানক কোলাহল, আহতের আর্ত্তনাদ, লাঠি ও বাঁকারির শব্দ, ইটপাটকেলের বৃষ্টি, চারিদিকে লুটপাট,—দিশেহারা হয়ে গেলাম।

সরকারি আলোটা হঠাৎ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। অন্ধকার পথে পিশাচের নৃত্য চল্‌তে লাগল।

মায়ের কণ্ঠ হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনে চোখে। দুল্‌ছে সব। দুল্‌ছে পৃথিবী, দুল্‌ছে আকাশ। জানিনে আমি কোথায়। বিলোল তন্দ্রা নাম্‌ছে দৃষ্টির সুমুখে। বহুদূর থেকে যেন জনতার অস্পষ্ট কোলাহল একটিবার কানে এল,—পুলিশ পুলিশ,—পালাও—

সঙ্গে সঙ্গে দূরে বন্দুকের আওয়াজ! গভীর নিদ্রায় আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

চোখ চেয়ে দেখি সকাল হয়েছে। সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় হাঁসপাতালে শুয়ে রয়েছি। মা বসে আছেন কাছে, তাঁরও মাথায় ব্যাণ্ডেজ। মাথার কাছে অশ্রুমুখি ভগবতী। ওপাশে গণপতি চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে। তার পাশে দাশু ও তার প্রিয় বিড়িওয়ালা। স্বপ্নের মতো গতদিনের ঘটনা মনে পড়ছে, স্বপ্নের মতো ভুলেও যাচ্ছি। ডাক্তার এসে দেখে বললেন আর ভয় নেই। হ্যাঁ, ভালো কথা। দেখেছেন ত কালকের খবরটা?

মৃদুকণ্ঠে বললাম, কি খবর?

ডাক্তারবাবু একখানা দৈনিক বাংলা কাগজ আমার চোখের সুমুখে ধরলেন। বড় বড় হরপে সংবাদ ছাপা হয়েছে—

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা

পারিবারিক কলহের পরিণাম

ঘটনাস্থলে হিন্দুরমণীর চমকপ্রদ বিক্রম

হিন্দুদের পক্ষে এক কাবুলীওয়ালার অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ

পুলিশের গুলিতে জনতা ছত্রভঙ্গ

একদিন হাঁসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। দুর্ব্বল দেহ বাতাসে দুলছে। যারা আহত হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। গণপতি এখনো সেরে উঠতে পারেনি, কিন্তু তার মা তাকে বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। দাশু পুলিশের হেপাজতে। আমরা সবাই জানি, যেমন করেই হোক নিজেকে সে খালাস ক'রে নেবেই। দাঙ্গার নায়ক সেই বিড়িওয়ালার অবস্থা খুব খারাপ। রক্ত বমি করছে। বিশেষ আশা নেই।

কিন্তু জীবনের এই ত রূপ? কেন ছুটেছিলাম অন্যায়ের প্রতীকার করতে? কী ফল পেলাম? মানুষকে কোনোদিনই সংস্কার করা যায় না, এই সামান্য কথাটা মানুষ কেনই বা এত সহজে ভুলে যায়! পৃথিবীতে এত ধর্ম্মশাস্ত্র, এত নীতি-কথা, এত হিতোপদেশ, তবু ত অন্যায়ের প্লাবনে সব গেল ভেসে; বলদর্পী আর দুর্ব্বলের সেই চিরন্তন প্রশ্ন রয়ে গেল।

অনেক দুঃখে খুঁজে পেলাম আপন সত্যকে। আর দেবোনা নিজেকে ফাঁকি। আর বলব না সংসারে ভালোবাসা আছে, দাক্ষিণ্য আছে, সদ্বিবেচনা আছে। কে করে কা'কে আঘাত, কে প্রতারিত করে তোমাকে, কে কা'র পায়ের তলায় হয় দলিত—এ নিয়ে ভয়ানক আন্দোলন করার কোনো প্রয়োজন নেই। সকলের পিছনে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা নিয়ম, দুর্ব্বার একটা ইচ্ছাশক্তি, তুমি এবং আমি তার অঙ্গুলি-হেলনে উঠি বসি। মানবচরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করবে? দানবকে করবে দেবতা? কালোকে করবে শাদা? সামান্য একটি ফুল ফোটাবার সাধ্য আছে তোমার? গাছের একটি পাতা তুমি নাড়াতে পারো?

মায়ের কাছে যখন এসে পৌঁছলাম তখন অপরাহ্ণ। ঘরের ভিতরে নানা কণ্ঠের আলাপ শোনা যাচ্ছিল। আর রুচি নেই। মানুষের মুখ দেখে বেড়াবার আর উৎসাহ নেই, আর শুন্‌ব না তাদের কথা। কথায় ভ'রে উঠ্‌ল জীবন, কথার ভারে ভারাক্রান্ত। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। সকলের কথা থাম্‌ল

মা উঠে এসে হাত ধ'রে বসালেন। ও-পাশে জগদীশ, এদিকে বাণীপদ, শম্ভু ও প্রভাত, —লোকনাথ এখানেও নেই।

আদর অভ্যর্থনার পর আমার প্রশংসা সুরু হোলো। সংবাদপত্রে আমার সুখ্যাতি বেরিয়েছে। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে আমি নাকি নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলাম। আমার মতো তরুণ যুবক জাতির গৌরব, আমি আদর্শ।

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অপরিসীম ক্লান্তিতে সব প্রশংসা ডুবে গেল। বড় ক্লান্ত, আমি বড় অবসন্ন। সুখ্যাতি আর শুন্‌তে পারিনে, এদের পাশে আছে গভীর একটা বিরক্তি, বিপুল অবসাদের বোঝা। কিন্তু নীরবে বসে রইলাম।

বাণীপদ বোধ করি অনেকক্ষন আগে এসেছিল, এবার বললে, আমি উঠি তবে আজকের মতো।

তার মতো অভিজাত মানুষের পক্ষে আমাদের ভিতর আসাই একটা নূতন ঘটনা। মা বললেন, বিশেষ খুসি হলুম তোমাকে দেখে, মাঝে মাঝে এসো বাবা। তুমি কবি আর দার্শনিক, মুখোজ্জ্বল করেছ দেশের, তোমার ভরসা করি আমরা সবাই—

বাণীপদ বললে, আপনাদের খবর আমি নিয়মিতই রাখি। মাঝে কেবল দাঙ্গাহাঙ্গামা আর পুলিশের কাণ্ড দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলাম।

মা হেসে বললেন, জানি এটা তোমার সহ্য হয় না। তুমি থাকো অনেক দূরে। হাঙ্গাম-হুজ্জতে তোমার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম রুচি, নীতি আর সৌন্দর্য্যবোধ উৎপীড়িত হয়। সবই জানি বাণীপদ। এদের সঙ্গে জীবনের কোনো অবস্থাতেই তোমার ঐক্য ঘটবে না তাও জানি বাবা। কিন্তু তার জন্মে তুমিও দুঃখ ক'রো না, এদেরো কোনো দুঃখ নেই।

বাণীপদ বললে, খবরের কাগজে লক্ষ্য করেছিলেম ঘটনাটা, কিন্তু আশা করিনি সোমনাথরা আছে এর মধ্যে, জানিনি যে আপনার উৎসাহ ছিল এই রক্তপাতে—

মা হাসলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, আগুনটা জ্বল্‌ল না তাই আমার দুঃখ বাণীপদ। খবরের কাগজে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ব'লে ছাপা হয়েছে, এত বড় ভুল আর নেই। বিবাদ কেবল দাশু আর গণপতির মধ্যে, উদ্ধত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল প্রতিবাদ। আমরা যোগ দিয়েছিলুম, অন্যায় করিনি।

তাঁর উত্তরে বাণীপদ বোধ হয় খুসি হোলো না, মা সেটা লক্ষ্য করলেন। তাঁর মুখ দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। বললেন, তুমি ব'সে আছ ঐশ্বর্য্যের রত্নবেদীতে। বাণীর পূজো করো, বাণী শোনাবার জন্মে উদ্‌গ্রীব। আত্মীয়দের দূরে ঠেলে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করেছ। এরা তোমার পর হয়ে গেছে, তুমি বুঝতে পারোনি। কিন্তু এরা কি চেয়েছিল জানো? ঘোচাতে গিয়েছিল লজ্জা, মোছাতে গিয়েছিল কলঙ্ক। দুর্ব্বলের চিত্তগ্লানি তুমি বুঝবে না বাবা।

তাঁর কণ্ঠ আবেগে কেমন যেন কেঁপে উঠ্‌ল।

মায়ের কণ্ঠে আঘাতও ছিল, অভিনন্দনও ছিল। দুটোই তরবারির মতো ধারালো। উপস্থিত সবাই স্পষ্ট জানে, বাণীপদর সঙ্গে তাঁর

ঘনিষ্ঠতা নেই, ঘনিষ্ঠতা যাও চান্ না, কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির ছায়ায় দাঁড়ানো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বাণীপদ নীরবে বসে রইল, মায়ের মেজাজটা সম্ভবত তার ভালো লাগেনি। না লাগারই কথা। যদিও জানি তার চরিত্রটা তার সাহিত্যের মতোই শান্ত ও স্নিগ্ধ; কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তার, সেখানে মায়ের মতো তারও আপোষ নেই।

ভদ্র এবং বিনীত ভাবে এক সময়ে বিদায় নিয়ে সে উঠে গেল। বাইরে তার মোটর দাঁড়িয়ে ছিল।

মা কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। আপন মনে একবার হাসলেন। পরে বললেন, গণপতির কি খবর, সোমনাথ?

বোধ হয় একটু সুস্থ আছে।—বললাম! কিন্তু কোনো কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করতেই আজ আমার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই।

জগদীশ বললে, তা ত থাকবেই, জীবন-সংগ্রামের দুঃখ-দহন এখনো তার অনেক বাকি।

মা উঠে গিয়ে ফস ফস ক'রে একখানা চিঠি লিখে বললেন, প্রভাত, তুমি একবার যাও বাবা গণপতির ওখানে। কাল সকালে আমি যাবো বলে এসো। আর এই টাকা ক'টা দিয়ো তার মার হাতে।

চিঠি ও টাকা নিয়ে প্রভাত তখনই চ'লে গেল। মা বাইরে গেলেন তার পিছনে পিছনে।

এবারে বললাম, তোমাকে দেখে বাঁচলুম ভাই, জগদীশদা। কিন্তু তোমার মুখ শুক্‌নো কেন বলো ত?

জগদীশ নিশ্বাস ফেলে বললে, তোদের জন্যে ভেবে ভেবে। বাস্তবিক, পরদুঃখকাতর হবার কারণটা নিজেই বুঝতে পাচ্ছিনে। আমার কি মাদোর্ব্বল্য ঘটেছে?

কই, তোমার ত এ বালাই ছিল না ?

তাইত, ভাবছি আর একবার তোদের জন্যে স্বরাজ আনার চেষ্টা করা যাক্। যাই জেলে। আর এই ধরো, বার দুই জেল্ খাটলেই —নেতা। যেমন তেমন নেতা হলেও অন্তত দুবেলা ঘি-ভাতটা কেউ মারবে না। যাবো নাকি ?

হঠাৎ তার এই বৈরাগ্যের ভনিতায় কৌতূহল এলো মনে। হেসে বললাম, বৌদিদির খবর কি ?

প্রিয়ম্বদার ? নতুন ভক্তের দল জুটেছে তাঁর। খুসি আছেন। স্ত্রীলোকের খবর কি পুরুষের কাছে নিতে আছে ! ও খবর জানতে হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে। স্বাধীন জেনানার প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়।

তুমি কি সেই দুঃখেই জেলে যাবে ?

অনেকটা তাই বটে। আশা, পূজায় দেবী খুসি হবেন, বরদান করবেন। সোমনাথ, মেয়েরা প্রশংসার তোয়াজেই কেবল বাঁচে, সমালোচনার আঘাত সইবার মতো মেরুদণ্ড তাদের নেই।

বললাম, তোমার মেরুদণ্ড আরো পলকা জগদীশদা। অবহেলার আত্মগ্লানিতে তোমার গাত্রদাহ হয়েছে। তুমি কি আগে তাঁকে বুঝতে পারোনি ?

তিনি ত দেশের কাজ করতে আসেন নি, এসেছিলেন নিজের কাজ গোছাতে। প্রশংসা না শুনলে তিনি চটে যান, জনসাধারণের আয়নায় আপন রূপের চাকচিক্য না দেখলে তিনি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন।

এখন তিনি কোথায় ?

কেন, বাড়ীতে। বাড়ীতে না থাকলে তাঁর চল্‌বে কেমন ক'রে ? মানে ?

মানে, অবিনাশবাবুর মোটর আছে, টেলিফোন্ আছে, এবং চাঁদা জোগাবার সাধ্য আছে। অবিনাশবাবুর মতো স্বামী না হ'লে দেশের কাজে যথেষ্ট অবসর মেলে না, এ কথা তোর বুঝতে দেরি হয় কেন রে বোকা!

এমন সময় মা এসে দাঁড়ালেন। আমাদের কথাবার্ত্তা থাম্‌ল। মা বললেন, তাহলে লোকনাথের খবর তোমরা পেলে না, কেমন?

জগদীশ বললে, কই আর পেলুম মা, তার মাসির ওখানে গিয়েছিলুম, তিনিও জানেন না। আমার বিশ্বাস, সে কলকাতায় নেই, মা।

আমি বললাম, কিছুদিন থেকেই তার মেজাজটা রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। আশ্রমের স্বামীজী বললেন, সে নাকি আসামের বন্যার স্বেচ্ছাসেবক হয়ে চ'লে গেছে। তার অনেক দুর্ব্বুদ্ধি ছিল কিন্তু পরোপকার করার বোকামিটা ছিল না, মা।

পরের কাজে তার উৎসাহ আছে।

না। ওটা উপলক্ষ্য। সবাইকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়াটাই তার অভিসন্ধি। এখন যদি সে সন্ন্যাসী হয় তবে বুঝবো ভবিষ্যতে দেশে গাঁটকাটার অভাব ঘটবে না!

মা প্রথমটা জগদীশের কথায় হাসলেন। পরে বললেন, ভুল করেছে সে। ছেড়ে যাবে কোথায়, মন যে যার সঙ্গে। কিছু না পেয়ে যারা সন্ন্যাসী হয়, কিছু পেলেই আবার তারা ফিরে আসে। আমার ছেলেরা দরিদ্র আর নিরুপায়, তাই তাদের জীবনে এমন বিশৃঙ্খলা। বাণীপদর সঙ্গে তোদের বন্ধুত্ব চলে না বাবা, সে পেয়েছে সব। পেয়েছে ঐশ্বর্য্য, নিশ্চিন্ত অন্ন, অবারিত স্বাচ্ছন্দ্য—সংসারের সব জাতের স্নেহ তার দরজায় বাঁধা। নির্ব্বিঘ্নে বাঁচে বলেই তার

কাব্য আর সাহিত্য-সৃষ্টির অবকাশ আছে যথেষ্ট। তার সমাজ আর তোদের সমাজ এক নয় বাবা।

শম্ভু চুপ ক'রে বসে ছিল। মা তার দিকে চেয়ে বললেন, শম্ভু, তুই যা বাবা আসামে, খুঁজে নিয়ে আয় লোকনাথকে। সবাইকে সে ত্যাগ ক'রে গেছে কিন্তু আমি তাকে ছাড়তে পারব না।

শম্ভু উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে। বললে, পারব বলেই যাচ্ছি। যতদিন না পারব ফিরব না। আশীর্ব্বাদ করো মা, যারা দুঃখী, যারা পতিত, দুর্ভাগ্যে যাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, তোমার কাছেই তাদের যেন এনে হাজির করতে পারি।

মা আশীর্ব্বাদ ক'রে হেসে বললেন, তোদের যদি আশ্রয় দিই তবে জান্‌বি আমি নিজেও আশ্রয় পেলুম।

কিন্তু আমাদের সকল আলাপের পিছনে কেবল যে একটা কঠিন সমস্যাই ছিল তাই নয়, ভয়ানক একটা নিরুৎসাহও ছিল। ভগবতীকে নিয়ে আমরা সবাই বিব্রত। বঙ্কিম আর ভগবতীর সমস্যা কেবলমাত্র মা, জগদীশ আর আমি জানি। ঘটনাটা গোপনীয়।

একদিন বললাম, মা, তোমাকে কেন্দ্র ক'রে আমরা গ্রহ-নক্ষত্রের দল ঘুরব তুমি রাজি আছো ত?

মা আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, একদিন তোরাই ত আমাকে ত্যাগ করবি বাবা।

এই কথাটা বহুবার শুনেছি তাঁর মুখে। কখনো অর্থ বুঝেছি, কখনো যেন শুনতেই পাইনি এমনি ভাবে চুপ ক'রে গেছি।

বললাম, আমরা তোমাকে ত্যাগ করব, এ তুমি কল্পনা করতে পারো?

মা বললেন, পারি বৈ কি বাবা। এ ত' অতি সহজ কথা। দেশে দেশে তোরাও মা পাবি আমিও পাবো দেশে দেশে সন্তান। ছাড়াছাড়ি হতে পারে একথা ভাবা ত কঠিন নয়!

একটু আহত হলাম। বললাম, তবে কি বুঝবো তোমার সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, স্থায়িত্বের দিক থেকে তার কোনো দাম নেই?

নাও থাকতে পারে, সোমনাথ। তোরা ভাবিস, আমি কিন্তু ভাবিনে। যে মা গর্ভে ধারণ করেছে, অনেক সন্তান বিশেষ বিশেষ কারণে তাকেও ত ছেড়ে আসে।

উত্তেজিত হয়ে বললাম, তারা পশু, তারা ইতর, তারা—

মা হেসে বললেন, সবাই ত পশু নয় বাবা, তাদের মধ্যে মানুষও আছে। বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ববোধের যে ধারা তাকে মান্‌তে গেলে অনেক মা'কে হয়ত ছাড়তেই হয়, অনেক সন্তানকেও দিতে হয় ভাসিয়ে এ কথা বোঝা ত কঠিন নয়, সোমনাথ?

তুমি কী বলতে চাও মা?

বলছি যে মাতৃস্নেহটা বড় কিন্তু তার চেয়ে ও বড় নির্ম্মল নির্লিপ্ত বিবেকবুদ্ধি, নিরভিমান জ্ঞান, উদার জীবনাদর্শ—এ যেখানে নেই সেখানে মাতৃস্নেহ কেবলমাত্র অন্ধ একটা পাশবিক বন্ধন, তাকে ছিঁড়ে ফেলাই স্বাস্থ্যকর।

বললাম, তুমি কি বলতে চাও তোমার আদর্শ আর মতবাদের সঙ্গে আমাদের না মিললে তুমি আমাদের ত্যাগ ক'রে যাবে?

হ্যাঁ। যদি তোদের গর্ভেও ধরতুম তাহলেও ত্যাগ ক'রে যেতুম সেই কারণে।

পারতে?

নিশ্চয় পারতুম বাবা, সেই ত আমার ধর্ম, সেই আমার মনুষ্যত্ব। যদি না পারতুম তবেই ঘটত আমার অপমৃত্যু!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। আমার মাথার উপর তাঁর হাতখানা স্থির হয়ে ছিল। এক সময়ে মৃদুকণ্ঠে বললাম, আচ্ছা মা, তোমার কি এমন কোনো কথা আছে যার সঙ্গে আমাদের আদর্শের বিরোধ ঘটতে পারে?

মা হেসে বললেন, থাকা কি সঙ্গত? আমি আশা করব, মা ও সন্তানের মধ্যে কোথাও বিরোধ নেই; আর যদি থাকেই, তাতেই কি আমি ভুলব যে তোরা আমার দুঃখের সন্তান? আমি ত পাথর নই, বাবা।

এমন সময় নিচে থেকে কা'র গলার আওয়াজ শোনা গেল।

মা উঠে বাইরে গেলেন। কে যেন জগদীশের খোঁজে এসেছে। অস্পষ্ট গলার আওয়াজে বোঝা গেল, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। তিনি যে প্রিয়ম্বদা এ সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় রইল না।

নীরবে বসে রইলাম। সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ উপরে উঠে এল। মা বললেন, জগদীশ ত এখানে থাকে না, আসে মাঝে মাঝে। তোমাকে ত চিনতে পাচ্ছিনে মা?

উত্তরে শোনা গেল, সোমনাথবাবু আছেন? তাঁকে হলেও চলবে।

পরিচিত কণ্ঠ শুনে তৎক্ষণাৎ উঠে বাইরে এলাম। সম্মুখে দাঁড়িয়ে হেমন্ত। তাড়াতাড়ি সে মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। আমি বললাম, চিনতে পারলে না মা, এ যে হেমন্ত।

তুমি হেমন্ত? ওরে আমার লক্ষ্মী, এসো মা এসো।—মা তার চিবুক ধরে আদর করলেন। বললেন, কতদিনের সাধ, তোমাকে দেখব। হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল কিসের টানে?—মা হাসতে লাগলেন। তাকালেন একবার আমার দিকে।

রুক্ষ চুল, শুষ্ক শরীর উপবাসী ও পথশ্রান্ত,—হেমন্তর চঞ্চল চোখে উদ্বেগ। কিন্তু মায়ের দিকে একটিবার মাত্র তাকিয়ে দ্রুত আমার কাছে এসে মায়ের সুমুখেই বললে, তুমি নাকি মার খেয়ে হাঁসপাতালে গিছলে? কে করেছিল এমন সর্ব্বনাশ? কা'র জন্যে তোমার এই শাস্তি?—চোখে তার জলের রেখা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

আমি বিব্রত, বিপর্য্যস্ত—মায়ের সম্মুখে মাথা হেঁট ক'রে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। লজ্জায় আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল।

মা চলে যাবার পর বললাম, তুমি যে এলে ঝড়ের মতন? খবর দিলে কে?

হেমন্ত বললে, জামাইবাবু, চিঠি দিয়েছিলেন।—তারপর সে ছেলেমানুষের মতো পুনরায় বললে, আমি দিনকতক কল্‌কাতায় থাকতে এলুম।

তথাস্তু। এখন ঘরে গিয়ে বসবে চলো।

হেমন্ত জানে না কোথায় ভেঙেছে আমার মন। কোথায় কখন্ কা'র মন ভাঙে, কোথায় অলক্ষ্যে প'ড়ে ওঠে, কেই বা জানে তার গোপন ইতিহাস! একদিন যে আগ্রহ ও আয়োজন নববর্ষার মেঘের মতো আমার সকল আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল আজ তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই, পরিচ্ছন্ন ও পরিমার্জ্জিত, বিবর্ণ ও নির্লিপ্ত। জলে রঙ ধুয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে রামধনু,—বৃহৎ বৈরাগ্যে এখন সমস্ত মন যেন নিস্পৃহ।

নানা কথার পর বললাম, কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে, হেমন্ত।

কি কাজ?

এখনই পরিষ্কার ক'রে বলতে পারিনে। কিন্তু অন্য কাজ আমি করব। এমনও হতে পারে ভাববোই কেবল, কাজ কিছু করব না। এক সময় সব কিছুর প্রতিই থাকে আমার আগ্রহ, অত্যন্ত নিবিড় ক'রে জড়িয়ে থাকি সংসারের সব হাসিকান্নার সঙ্গে, কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে রঙ আসে ফিকে হয়ে। এ কেন? এর পিছনে কী রহস্য বলতে পারো?

নিচে পায়ের শব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ হয়ে ফিরে তাকালাম। চেয়ে দেখি, জগদীশ গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছে।

হেমন্ত হেসে উঠে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে। বললে, আপনার জন্যে সেই কখন্ থেকে ব'সে আছি জামাইবাবু।

সত্যি বলচিস ত? বেশ, চিঠি পেয়েই তুই যে আসবি এ ত' জানা কথা। এবার সাম্‌লা তোর সোমনাথকে। বাবুকে সঙ্গে আনলেই ত পারতিস, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে একটা বাসা ভাড়া নিলে একরকম ভালোই হোতো। মায়ের চেয়ে মাসির দরদটাও মানিয়ে যেতো।

হেমন্ত বললে, এই বা মানাবে না কেন?

জগদীশ বললে, কোম্পানীর রাজত্বে বিপত্নীক ভগ্নিপতি আর প্রোষিতভর্তৃকা শালীর একত্র থাকার আইন নেই ভাই।

আমার দিকে ফিরে হেমন্ত বললে, আপনি কোথায় থাকবেন?

উত্তরটা দিলে জগদীশ। বললে, ওর কথা আর বলিসনে হেমন্ত। শীতের মরা ডালে শেষ পাতাটির মতন ও সংসারকে ছুঁয়ে রয়েছে, যাই যাই করছে। ওর ভরসা যে করে, বালির ওপর সে ঘর বাঁধে। ও দয়িত হতে পারে দায়িত্ব নিতে পারে না,—ও যে তরুণ। ভরসা করিসনে ভাই তরুণদের, বর্ষার বন্যার মতন ওরা

ক্ষণস্থায়ী, ভয়ানক গতিশীল। তৃষ্ণার জল ওরা দেয় না, ওরা ভাসায় প্লাবনে।

হেসে বললাম, জগদীশদা, বৃদ্ধ বয়সে তোমার ঈর্ষা?

ঈর্ষাটা কি বল্? হরি হরি, আমি যে বড় গাছে নৌকো বেঁধেছি রে, আমার ভাবনা কি! প্রিয়ম্বদা আর বাণীপদর ফ্যাশনেবল্ সমাজে এই হেমন্তর দাম তিন পয়সা।

অনেকক্ষণ হেসে আমাদের হাসি থাম্‌ল। তারপরে কথা হোলো, মা এসে হেমন্তর থাকার ব্যবস্থা করবেন। যদি এখানে সুবিধা না হয় তবে আশ্রমে জীবনকৃষ্ণর তত্ত্বাবধানে হেমন্তকে কিছুকাল রাখা যাবে, অতঃপর বাসা ভাড়া করবে জগদীশ। বাবুকে আনা হবে।

প্রিয়ম্বদা দেবীর কি খবর জামাইবাবু?

তাঁর খবর ভাই নিত্যিনতুন।

কেন?

আমি তাঁর যশপ্রচারের কর্ম্মচারী; যাকে বলে, 'পাব্‌লিসিটি অফিসার'। কাগজে বরং প'ড়ে নিয়ো তাঁর ক্রিয়াকলাপ। তিনি নিজেও কাটিং রেখে দেন্ শ্বশুরবাড়ীর লোককে পড়াবার জন্যে।

কি কাজ তাঁর?

দলাদলি। অর্থাৎ দলিত করবেন তিনি সবাইকে। তিনি যে-পাড়ায় থাকবেন আর কোন নেতা অথবা নেত্রী মাথা তুলিবেন না সে-পাড়ায়।

এই দলে আপনি থাকেন, জামাইবাবু?

মুহূর্ত্তের মধ্যেই জগদীশ আত্মসম্বরণ করল। বললে, বেশ লাগে তাঁকে, আরো বেশ লাগে তাঁকে বিদ্রূপ করতে।

এমন সময় মা এসে পড়লেন। সস্নেহ হেসে বললেন, বিশেষ কাজে বিশেষ ব্যস্ত, তোমাদের আলাপে যোগ দিতে পাচ্ছিনে। তুমি ত এখন থাকবে, হেমন্ত ?

হেমন্ত বললে, যদি সুবিধে হয় তবে কিছুদিন থেকে যেতে পারি, মা।

বেশ ত, জগদীশ করবে তোমার থাকার ব্যবস্থা। তুমি যখন রইলে তখন একটু অবসর পেলেই আমি গল্প করতে বসে যাবো। কোথায় নিয়ে রাখবে ওকে, জগদীশ ?

কোথায় আপনি রাখতে বলেন ?—জগদীশ বললে।

আশ্রমে যদি রাখো ?

সেখানে ওকে একলা থাকতে হবে যে ?

ক্ষতি কি ? থাকবে জীবনকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে কোন ভয় নেই। বেশিদিন ত' হেমন্ত আর থাকবে না !

বেশ, তাই ওকে নিয়ে যাই।

তাই যাও, কারণ আমি ত এখানে থাকচিনে। বোর্ডিংও তু'লে দিচ্ছি। কেবল থাকবে ভগবতী আমার কাছে। এই ব'লে তিনি অগ্রসর হলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

বারান্দা পার হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি, খাটের একান্তে ভগবতী শুয়ে রয়েছে। স্কুলে সে পড়ায়, কিন্তু বিশেষ কারণে দিন কয়েকের জন্য তাকে ছুটি নিতে হয়েছে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়েও সে জাগল না, কিন্তু জানি এ তার ঘুম নয়। চোখে তার ঘুম আর নেই। কথাবার্ত্তা বলা একরূপ সে ত্যাগই করেছে।

ভিতরে এসে মা দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। পরে বললেন, মুখেই আমার সাহস কিন্তু আমি আর কিছু ভেবে স্থির করতে

পাচ্ছিনে। আমি অত্যন্ত বিপন্ন, অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় পড়েছি বাবা, জানিনে এর থেকে কেমন ক'রে উত্তীর্ণ হবো। বঙ্কিম ভগবতীর সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে।

মাথা হেঁট ক'রে বললাম, কারো কোনো অপরাধ নেই মা, এই আমাদের নিয়তি।

মা বললেন, তাই ব'লে চুপ ক'রে থাকলে ত চলবে না বাবা, প্রত্যেকটি দিন এখন থেকে দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠবে। এদিকের অবস্থা বুঝতে পারচিস ত? বোর্ডিং যাবে উঠে, আমার হবে দুর্নাম, কলঙ্ক রট্তে আর বাকি নেই। কা'র মুখে হাত চাপা দেবো? ভগবতীর মাথা ত হেঁট হোলো চিরদিনের জন্য, আর কোনোদিন ও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমাকে বল্ বাবা, আমি মেয়ে মানুষ কি করতে পারি।

তাঁর এই অসহায়তার ভিতর থেকে আমি যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম। বললাম, আমাকে আদেশ করো কি করতে হবে? আমি তোমার জন্য সকল রকমের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবো, মা।

পারবি বাবা?

পারব। তুমি আদেশ করো।

পারবি বাবা?—উগ্র আনন্দে তাঁর কণ্ঠস্বর বেজে উঠ্ল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, আবার বলছি, পারবি ত?

আমি তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, তবে আজ রাত্রে একবার আসিস বাবা আমার কাছে—যত রাতই হোক—

ভগবতী পিছন ফিরে উঠে ব'সে চোখের জল মুছলো। আমি সেইদিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে এলাম।

সিঁড়িতে নামবার আগে ফিরে দেখি, জগদীশ আর হেমন্ত আগেই চ'লে গেছে। আমারো আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। সোজা নেমে পথে এসে পড়লাম।

পথে পথেই সন্ধ্যা নামল। কোনো কাজ নেই, মায়ের আদেশ পালন করবার আগে আজ কেবলমাত্র একবারটি নিজের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ক'রে নেবার চেষ্টা করছি।

অনেক কথা ভাবছিলাম এমন সময় পিছন দিক থেকে এসে কে আমার হাত চেপে ধরল। অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে দুখীরামকে চিনতে আমার বিলম্ব হোলো না। সে বললে, দাদাভাই ?—বলেই কেঁদে উঠ্‌ল।

তার কান্না দেখে হঠাৎ আমারো চোখে জল এসে পড়ল! এই বৃদ্ধের উপর বাল্যকাল থেকে আমি অত্যাচার করে্ এসেছি, সেও নিঃশব্দে আমার সকল উৎপাত সহ্য ক'রে এসেছে, কিন্তু আমি তার স্নেহের যোগ্য মূল্য কোনোদিন দিইনি।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার হাত ধ'রে বললাম, তোর এমন অবস্থা কেন, দুখীরাম?

দুখীরাম জানালো বাবা তাকে বিতাড়িত করেছেন। চাকৃরি আর তার নেই। সবই জানি, তা'র দুর্ভাগ্যের আদ্যোপান্ত ইতিহাস আমিই সব জানি। আমারই কৃতকর্ম্মের শাস্তি মাথা পেতে নিতে সে একটুও কুণ্ঠিত হয়নি। একসময় সে বললে, তিনমাস আমার জেল্ হয়েছিল। জেলে গিয়ে এই বাঁ-চোখটায় অসুখ করে, কিন্তু এ আর ভাল হয়নি ভাই, একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল।

তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম, আয়, তুই আমার সঙ্গে। তোকে আশ্রয় দেবো কিন্তু আমাকেও তুই দিবি আশ্রয়। তোর শেষ বয়সের

ভার আজ থেকে আমি তু'লে নিলুম দুখীরাম। আয়।

আশ্রমে এসে যখন পৌঁছলাম তখন কিছু রাত হয়েছে। সেটা শুক্লপক্ষ, হয়ত একাদশী অথবা দ্বাদশী হবে। জ্যোৎস্নায় সমস্ত আশ্রমটা শাদা হয়ে উঠেছে। আলো জ্বালাবার আর প্রয়োজন হয়নি, সব আলো নেবানো। রোয়াকে উঠে দুখীরামকে আমাদের ঘরখানা দেখিয়ে দিলাম। বললাম, মাদুর বিছানা আছে, শুয়ে পড়। আমি খাবার ব্যবস্থা ক'রে আনিগে।

সে প্রতিবাদ করতে গেল, কিন্তু তার আগেই আমি পথে নেমে গেলাম। আজ তার কিছু সেবা ক'রে আমি ধন্য হবো।

দুখীরামকে সুস্থ ক'রে শুইয়ে মেয়েমহলের দিকে গিয়ে প্রথমেই দেখলাম, দরজার কাছে ঘোমটা দিয়ে হেমন্ত বসে রয়েছে এবং তারই অদূরে দালানের ধারে জীবনকৃষ্ণ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে। আলোটা আমি জ্বেলে দিলাম। কিন্তু দু'জনের কেউই আমার সঙ্গে কথা বললে না, বরং আমাকে দেখে ব্রহ্মচারী তাঁর আহ্নিকের ঘরে চ'লে গেলেন।

জগদীশ কোথায় গেল, হেমন্ত ?

হেমন্ত একরকম বিস্ময়কর কণ্ঠে জবাব দিল, ঘর খুঁজতে গেলেন।

ঘর খুঁজতে ? তুমি থাকতে চাওনা এখানে ?

না।

আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, এতক্ষণ সে কাঁদছিল। সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা। সে যে চোখের জল ফেলবে এমন আশা আমি করিনি। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে বললাম, এত কষ্টই যদি হবে তবে মাকে আর বাবুকে ছেড়ে এলে কেন ? গ্রাম ছেড়ে শহরে এলে প্রথমটা কান্নাই পায়।

হেমন্ত উত্তর দিল না। বললাম, বেশ ত, এখানে যদি ভালো

না লাগে এখনই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তুমি ত আর জলে পড়নি।

হেমন্ত মুখ তুলে বললে, কেন তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে বলো ত?

তার কণ্ঠ শুনে আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সে পুনরায় বললে, চিরদিনের জন্য যাকে মন থেকে মুছে দিয়েছি, তাকে দেখ্‌বার দরকার নেই ত আমার? কেন তোমরা আমাকে এই বিপদে ফেলেছ?

কী হোল, হেমন্ত?

চলো এখান থেকে আমাকে নিয়ে। এখনই চলো, একদণ্ডও আর থাক্‌ব না।—দ্রুত সে উঠে দাঁড়ালো।

বেশ ত, এখনই যাবে। কিন্তু ব্যাপার কি?

জীবনকৃষ্ণর ঘরের দিকে চেয়ে হেমন্ত বললে, উনি যে এখানে এসে আশ্রম করেছেন আমি কি জানতুম?

স্বামীজীর কথা বল্‌চ? চেনো তুমি ওঁকে?

হ্যাঁ, চিনতুম আট বছর আগে। এখন আর চিনিনে। চলো, যেদিকেই হোক তুমি আমাকে নিয়ে চলো।* এই ব'লে হেমন্ত উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণে সমস্তটা উপলব্ধি করলাম। বললাম, আমি ত জানতুম না জীবনকৃষ্ণ বিয়ে করেছেন, কোনো লক্ষণই তার দেখতে পাইনি। তোমার স্বামী উনি? আশ্চর্য্য, এ কথা আমরা কেউই ত জানতুম না? এ যে নাটক!

জ্যোৎস্না-রাত্রির জনহীন পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম মায়ের ওখানে।

মা ছিলেন জেগে। ডেকে নিয়ে গেলেন ভগবতীর ঘরে।

জগদীশ এলো, এলো হেমন্ত।

ভগবতী আলোটা জ্বেলে দিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে একপাশে বসল। মা ঘরের সব জান্‌লাগুলি খুলে দিলেন। ভিতরের আলোর সঙ্গে বাইরের জ্যোৎস্নার একরূপ মিলিত ঔজ্জ্বল্যে আমাদের ঘরের চেহারা গেল বদ্‌লে।

মা ভগবতীকে ডাকলেন, ভগবতী কাছে এসে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়াল। মা তার হাতখানি নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এর সামাজিক সম্মানের দায়িত্ব আজ থেকে তোর হাতে, বাবা। তোকে যেন ভগবতী স্বামী ব'লে পরিচয় দিতে পারে।

চমকে উঠলাম, বললাম, এ কি মা? ও যে—

জানি বাবা, কিন্তু যে-বিপদে. বঙ্কিম ওকে ফেলে গেছে, বন্ধু হয়ে তোকেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, সোমনাথ। স্বামীর পরিচয় না থাকলে ওর সমস্ত জীবন আজ থেকে নষ্ট হতে থাকবে। সেই ক্ষতি কি তোকে বাজবে না?

হেমন্ত আমার দিকে চেয়ে বললে, মার আদেশ অমান্য ক'রো না, এই সামান্য কর্ত্তব্য তোমাকে করতেই হবে। এ ভার তোমার, এ ভার আমার।

জগদীশের দিকে তাকালাম, সে হেসে বললে, মন্দ কি রে, জীবনে এমন খেলা ত খেলতেই হয়। বিনামূল্যে তুই ত সংসারের সবই পেলি রে গাধা! নাকও পেলি, নরুণও পেলি!

যে দ্বিধাটুকু আমার এসেছিল তার জন্য লজ্জিত হলাম, তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে বললাম, ক্ষমা করো মা, ভীরুতায় এসেছিল সঙ্কোচ। তোমার আশীর্ব্বাদই আমার কাছে বড়ো।

মা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে সাশ্রুনেত্রে আশীর্ব্বাদ করলেন।

ভগবতী তখন ফুলে ফুলে কাঁদছিল। হেমন্ত তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

হঠাৎ জগদীশ বললে, সবারই একটা যাহোক উপায় হোয়ে গেল। কেউপেলে স্ত্রী, কেউ পেলে স্বামী—কেউ বা আরো এক ধাপ—

তার কথার খোঁচায় হেমন্ত সলজ্জ হেসে আমার দিকে তাকাল।

মা এবার জগদীশের হাত ধরলেন। বললেন, তোকে আদর দেবো না জগদীশ, তোর প্রাপ্য কিছু নেই, স্নেহ-বঞ্চিত হয়ে চিরদিন ঘুরবি তুই সংসারের আনাচে-কানাচে—

তাঁর কথায় সচকিত হয়ে আমরা সবাই ফিরে তাকালাম। জগদীশ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে হেসে বললে, এমন আশীর্ব্বাদ কেন, মা? আমি ত তোমার ক্ষতি কিছু করিনি।

মা বললেন, আশীর্ব্বাদ নয়, তোকে দেবো অভিসম্পাৎ। তুই বেড়াবি মরুভূমিতে—

কি বল্‌চ, মা?—আমি বললাম।

ঠিকই বল্‌চি বাবা।—ব'লে মা আবার তাকালেন জগদীশের দিকে। আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, তোকে কাজ দেবো যা সকলের চেয়ে কঠিন। জীবন যেখানে মিথ্যার খেলায় ভ'রে উঠেছে, যেখানে ছদ্মবেশ আর অসাধুতা বেঁধেছে বাসা,—তাদের ভেতর ঘুরবি তুই। যা কিছু অসত্য তাদের তুই করবি বিদ্রূপের আঘাত, বাণে বাণে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবি; ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিবি ধারালো ব্যঙ্গের অস্ত্রে, তাচ্ছিল্য আর অবহেলায় মানুষের চরিত্রগত নীচতাকে করবি শাসন—এই কাজ তোকে দিলুম, বাবা।

জগদীশ তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বললে, একটা কাজ পেয়ে বাঁচলুম এতদিনে।